ওঁ মা

সাহেব সাধু

সুপ্তোত্থিত সুপ্রভাত প্রথমেই দর্শন করেন সাহেব সাধু সত্যানন্দ স্বামীকে। মনে পড়ে যায় বহুদিন ধরে শুনে আসা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী

বক্রেশ্বর শ্মশানের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে থাকা অনাচ্ছাদিত একটি মোটর গাড়ী—তারই মধ্যে বসে আছেন নগ্নদেহী সৌম্যমূর্তি এক সাহেব সাধু—তিনি আমেরিকানবাসী। গাড়ীটি তাঁহার আশ্রম—গাড়ীটাই তাঁহার কুটির বলা যাইতে পারে। খোলা গাড়ীটার মধ্যে অবস্থান করতঃ নিষ্পলক দৃষ্টিতে আকাশ-পানে চাহিয়া কি যে প্রার্থনা করিতেছেন—কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁর দৃষ্টিতে কি যেন যাদু মাখানো আছে। গাড়ীর পাশ দিয়া লোক চলাচল করিলেও তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয় না—কোন ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ কয়েকদিন হইল—তিনি তাঁর পুরানো আশ্রয় ত্যাগ করিয়া এই গাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন। —এর কারণ বক্রেশ্বর ধামের জনসাধারণ ও পাণ্ডারা বুঝিতে পারেন না—দিবসে কিংবা অন্ধকার রাত্রিতে অবস্থার পরিবর্তন হয় না।

এই জনপ্রিয় সাধককে সকলে নীরবে দর্শন করিয়া যান। বাক্যহীন—নড়নচড়ন—বিহীন—সাহেব সাধুকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া সকলে এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইয়া সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া যান।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্লান্তি বিহীন সাহেব সাধুর সম্বিত ফিরিলেও বড় একটা খাদ্য গ্রহণ করেন না।

অনুভূতির বিশাল রাজ্য করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন—সমস্ত অবয়ব যেন অপার্থিব ধাতুর দ্বারা গঠিত—সাধু-মূর্তির জলন্ত বিগ্রহ। চোখে মুখে আনন্দের দ্যুতি খেলিতেছে। দুই পাশের পথচারীর দল এই ঐশ্বর্য্যময় মূর্তি বিস্ময়ে নেত্রে দেখিয়া—তাঁহার অমোঘ আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া যায়—এইভাবেই তাঁর কাছে সুপ্রভাত একদিন বাঁধা পড়িয়া যায়। পুরানো আশ্রমে সুপ্রভাত প্রায়ই দেখিতেন—যে সাহেব সাধু আম্রবৃক্ষের নীচে নিজ হস্তের তৈরী "ওঙ্কার যন্ত্রটি" গভীর রাত্রে আপন মনে বেদন করিতেছেন—ওঙ্কার সাগরে নিজকে নিমজ্জিত হইয়া—শব্দ ব্রহ্মের অতলতলে।

সাহেব সাধুর পুরানো আশ্রম ত্যাগের সংবাদ পাইয়া সুপ্রভাত একদিন রাত্রিতে স্বামীজী সত্যানন্দের নিকট গমন করিয়া দেখেন যে সাহেব সাধুর চোখে-মুখে কোন ক্লান্তির বা দুর্যোগের ছাপ নাই—আছে শুধু দিব্যকান্তি হইতে স্বচ্ছ জ্যোতির হাল্কা বিচ্ছুরণ।

সুপ্রভাতকে দেখিয়া সাহেব সাধু বলিতে থাকেন—"তুমি এসেছো—ভালোই হয়েছে?" তোমার পূর্বেকার প্রশ্নের আজ

জবাব দেব, যাহা তুমি আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছ—"মৃত্যুর পর আত্মা কিভাবে অবস্থান করে? কি প্রকার গতি হয়?"

মৃত্যুর পরপারে আত্মার গতি সম্বন্ধে তোমার সামান্যতম জ্ঞান থাকিতে পারে—আছে কি?

—না স্বামীজী—আমার কোন জ্ঞানই নেই—এ সম্বন্ধে।

—তবে শোন। এই বলিয়া সাহেব সাধু আত্মার গতি সম্বন্ধে বলিতে শুরু করিয়াছেন।

বিদেহী অবস্থায় আত্মার গতি প্রকৃতি জানিয়া কর্মজীবনকে কৈলাসে পরিণত করিতে হইবে—আত্মিক সাধনাকে ছড়াইয়া দিতে হইবে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত নর-নারীর মধ্যে—তাহাই ৺মায়ের কর্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। 'দাসোহং' মনোভাব লইয়া ৺মাতাকে সম্মুখে রাখিয়া এই মানবাত্মার গতি সম্বন্ধে অজ্ঞানতার মল দূর হইলে মাতৃশক্তির ভাব মানুষের অন্তঃকরণে উদিত হইয়া থাকে। আত্মা এক—জ্ঞান অসংখ্য—এই অসংখ্য জ্ঞানের ছায়ায় আমরা আত্মাকে বহু দেখিয়া থাকি। প্রত্যেকে আমরা ব্যষ্টি চৈতন্যের অধিকারী—যেমন আত্মাস্বরূপ অখণ্ড আকাশে ব্যষ্টি চৈতন্যস্বরূপ অসংখ্য তারা ব্যষ্টি চৈতন্যস্বরূপ। এক অখণ্ড মাতৃশক্তি সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন—সমস্ত ভূত ভাবই তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। মৃত্যুর পর দুইটি পন্থার কথা বলিতেছি—একটিকে আশ্রয় করিয়া পুণ্যবান—যোগী বা সাধক পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না—আর একটিকে আশ্রয় করিয়া মানব পুণরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—বার বার জন্ম-মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়।

যে পথে শুক্ল পক্ষ, অগ্নি, জ্যোতি ও উত্তরায়ণ বর্ত্তমান—যোগী সাধক ও পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর সেই পথে গমন করিয়া মুক্তিলাভ করেন - পৃথিবীতে পুণরায় ফিরিতে হয় না। আর যে পথে কৃষ্ণপক্ষ, ধুম, রাত্রি ও দক্ষিণায়ন বর্ত্তমান- সে পথে গমন করিলে মানুষকে বার বার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়—সঞ্চিত পুণ্য ফলের ক্ষয়ের সাথে সাথে। সকল কর্মযোগীগণ উত্তম ভোগফল লাভের জন্য জনহিতকর কার্য্য, পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি মহৎ কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। এইসব ব্যক্তিগণের মৃত্যুর পর জীবাত্মাগণ কৃষ্ণাগতি লাভ করিলেও বাৎসরিক শ্রাদ্ধান্তে ভোগদেহ লাভ করিয়া ক্রমশঃ চন্দ্রালোকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন—চন্দ্রালোকে ভোগ-প্রাচুর্য্য আছে বটে, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগ, রোগ-শোক বিহীন বহুবিধ ভোগ কার্য্যে পুষ্ট। চান্দ্র-জ্যোতির যেরূপ ক্ষয় আছে সেইরূপ চন্দ্রালোকে আগত ব্যক্তিদের পুণ্যের ক্ষয় হইতে থাকে এবং তাহা সম্পুর্নরূপে ক্ষয় হইয়া গেলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অবশেষে চন্দ্রালোকে জলময় শরীর তাঁহার প্রাপ্ত হয়। সেই জল ক্রমশঃ আকাশের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। পরে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধুম্র, ধুম্র হইতে বাষ্প, বাষ্প হইতে মেঘ। মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া জীবাত্মাগণ গাছ-পালা, ধান্য-গম ইত্যাদি রূপে রূপে সঞ্জাত হইয়া মনুষ্যদের খাদ্যরূপে পরিণত হয়। এই সময় নানা গাছপালা—শস্যাদিরূপে জন্ম লইয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া বহুভাবে দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করে—ইহাই চুরাশী লক্ষ যোনীতে ভ্রমণ কহে। ভাগ্যক্রমে কোন পুরুষ ঐ শস্যাদি ভক্ষণ করিলে- তাহা রেতঃ বা বীর্য্যে পরিণত হয় পুরুষের দেহে।

সেই পুরুষের বীর্য্য বা রেত। কামিনীর গর্ভে সঞ্চারিত হইলে—সেই নারী সন্তানরূপে তাহা প্রসব করিয়া থাকেন এ পৃথিবীতে। ধর্মাধর্ম অনুসারে মনুষ্য উত্তম যোনী বা অধম যোনী লাভ করিয়া থাকেন। এইতো গেলো কৃষ্ণাগতির ফলাফল। কিন্তু শুক্লাগতি প্রাপ্ত জীবাত্মাগণ সর্বপ্রথম তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ শুক্লা অভিমানিনী দেবতাকে—তথা হইতে উত্তরায়ণ, ছয় মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, তৎপর সংবৎসর অভিমানিনী দেবতাকে তৎপর ক্রমে ক্রমে চন্দ্র-সূর্য্য তথা হইতে বিদ্যুৎ অভিমানিনী দেবতাকে, প্রাপ্ত হইয়া সত্যলোকে উপস্থিত হন—ইহাকেই শুক্লাগতি। পুণ্যকর্মের ফলে মৃত্যুর পর এইসব পুণ্যাত্মা জীবাত্মাগণকে পৃথিবীতে ফিরিতে হয় না।

সুপ্রভাত একদিন রাত্রিতে ৺ধরনী বাবার আশ্রমে যাইয়া ঐ সাহেব সাধু সম্বন্ধে ৺রনী বাবার মনোভাব জানিতে পারেন এবং সাহেব সাধুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শুনিয়াছিলেন—যাহা অনুমান-সাপেক্ষ ছাড়া কিছুই নহে। ১৮৫৯ সালের প্রথম পর্বে এই বক্রেশ্বর গ্রামের — নদীর তীরে গভীর জঙ্গল ও গুহার মধ্যে কয়েকজন বীর সন্ন্যাসী আশ্রয় লইয়া সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঈন্ধন যোগাইয়া যান। বক্রেশ্বর নদীর গুহার সংলগ্ন ঘন জঙ্গলটির একধারে চিনপাই জঙ্গলের সহিত, অন্যধারে চন্দ্রপুর জঙ্গলের সাথে যোগ হইয়া মসাঞ্জোড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিলো—সাপদ-শঙ্কুল এই বনে বড় একটা কেহ যাতায়াত করিত না। কিন্তু এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে বক্রেশ্বর নদীর তীরে সন্ন্যাসীদের কতকগুলি গোপণ আস্তানা ছিলো এবং সেখানে রীতিমত ঢাল-তালোয়ার—অশ্ব চালনা ইত্যাদি বিষয়ে

তাঁদের তালিম দেবার ব্যবস্থা ছিলো। এই তালিম মধ্য রাত্রিতে দেওয়া হোতো মনুষ্যের অন্তরালে। তখন রাজনগর রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে—সেখান হইতে কিছু যোদ্ধাকে আমদানী করিয়া এই তালিম দেওয়ার ব্যবস্থা করেন—বেশকিছু গৈরিকধারী বীর সন্ন্যাসীর দল। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহের ন্যায় তীব্র আকার ধারন করিয়াছিল।

গুপ্তচর দ্বারা সন্ধান পাইয়া গোরা সৈন্যরা এই বক্রেশ্বর নদীর তীরে জঙ্গলের মধ্যে সন্ন্যাসীদের গোপণ ডেরায় মধ্য রাত্রিতে হানা দিয়া বেশকিছু সন্ন্যাসীকে হত্যা করিলেও, তাহাদের ক্যাপ্টেনকে ফিরিয়া পায় নাই—তাহার দেহেরও সন্ধান পায় নাই। যতদূর শোনা যায়—আসলে এই ক্যাপ্টেন সাহেব মারা যান নাই—তিনি বীর সন্ন্যাসীদের হস্তে বন্দী হইয়া জঙ্গলের গুহার মধ্যে সন্ন্যাসীদের সাথে বাস করিতে থাকেন। পরিশেষে এই ক্যাপ্টেন আকৃষ্ট হইয়া সন্ন্যাস-ধর্মে দিক্ষীত হইয়া থাকেন। ব্রিটিশ সৈন্যদের চক্ষের অন্তরালে—সন্ন্যাস বেশে তিনি রাতারাতি পদব্রজে কাশী-ধাম যাত্রা করেন— ছদ্মবেশ ধারন করিয়া। ৺ধরনী বাবা গুরু পরম্পরায় গুরুর মুখ হইতে এই গোরা ক্যাপ্টেন সম্বন্ধে—যাহা বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে গোরা ক্যাপ্টেন অবয়বের সাথে এই সাহেব সাধুর অবয়বের ও চরিত্রের সম্ভাব্য মেল রহিয়াছে—তাই তিনি স্বামী সত্যানন্দকে বিগত জন্মের সেই সাহেব ক্যাপ্টেন বলিয়া নিজ মত গোপণ করিতেন—ইহাই ধরনী বাবার ধারনা প্রসূত।

তাছাড়া ৺ধরনী বাবা বলিতেন—"পৃথিবীর এতো জায়গা থাকতে কেন সাহেব সধু এই বক্রেশ্বর ধামকে পছন্দ করলেন? কেনই বা এতো কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি এখানে শান্ত ও সমাহিত চিত্তে হাঁসি-মুখে সাধনা করিয়া যাইতেছেন। কিসের বা এতো টান? আগের পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করিয়া খোলা আকাশের নীচে গাড়ীর মধ্যে অবস্থান করিয়া নিরন্তর সাধনা করিয়া যাইতেছেন? সমস্ত দেহ ঋজু করিয়া আকাশ-পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কি এক পরমের সন্ধান করিতেছেন। মস্তকের চতুস্পার্শে সূক্ষ্ম জ্যোতির বেষ্টনী—মুমুক্ষার অগ্নিতে দগ্ধ তাঁর জীবন।

বহু পূর্বের সংগঠিত বন্ধনের জের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া আবদ্ধ সাধনা পূর্ণ করিতে তাঁর এখানে আগমন। বক্রেশ্বরের চতুস্পার্শে ভ্রমণ এবং জনসাধারণের সহিত সংযোগ দেখিয়া বোধ হয় যেন সাহেব সাধু এখানের বহু দিনের বাসিন্দে—যেন কত পুরানো আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব তাঁর এখানে অবস্থান করিতেছেন।

৺ধরনী বাবার বিবৃতি অনুযায়ী শুনা যায়—সেই ইংরেজ ক্যাপ্টেন সাধু হইয়া সাধুর ছদ্মবেশে বহুদিন কাশীধামে অতিবাহিত করিয়া ফের পদব্রজে বেলুচী স্থানে মরুতীর্থ হিংলাজে উপস্থিত হন—নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে। পরে ক্রমে ক্রমে তিনি সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া শেষ জীবনে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। কুলু কুলু শব্দে মাতা সুরধনী সঙ্গে কত পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে বহু পাহাড়-পর্বত জঙ্গলের মধ্যে প্রবাহিতা "জীবন ক্ষণস্থায়ী—নদী চিরস্থায়ী"। এই চিরন্তন গান নদী পথে সদা ধ্বনিত হইতেছে। এই বদরীনারায়ণ ধামে পদর্পেণ করিয়া বহুদূর হইতে মাতা বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা ও পিতা বিশ্বশ্বরকে স্বরণ করিয়া

তাঁহার আধ্যাত্মিক আকাঙ্খা পূরণ করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছেন। সর্বপ্রথম এই পর্বত শ্রেণীর সংলগ্ন ক্রোঞ্চ পর্বতে উপস্থিত হইয়া পুররাক্ষ নামক শিব মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতা বিশ্বেশ্বরী সহিত পিতা বিশ্বেশ্বরের পূজা সমাপণ করতঃ চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকেন। জলস্থল-আবাস মনোহর—বিদেহী মুনি ঋষিরা আছেন বহুতর—এই ধামের এখানেও পূজে সবে হর-পার্বতীকে—বীণা বাজে, বংশী বাজে—গাহে সবে গীত—সেই গানের মুচ্ছর্না বহুদূর ভাসিয়া যায়। একপদে দণ্ডায়মান হইয়া বহু সাধক-সাধিকাকেও হর-পার্ব্বতীর স্তব করিতে দেখা যায়।

জাহ্নবী কুলে বদরিকাশ্রম অবস্থিত
বদরিকাবৃক্ষ তথা শোভে ফল-ফুলে
অমৃত সুরে কোকিল-কোকিলা ডাকে
বৃক্ষের ডালে ডালে।

আর এক মন্দিরে শোভে প্রভু বদরিনারায়ণ
মন্দির প্রাঙ্গণের অন্তরীক্ষে
রয়েছেন ঋষি-মুণি হয়ে যোগপরায়ণ।

বহুদূরে দেখা যায়—পর্বত বৈরত মনোহর রেবা নামে পুণ্যবতী নদী বহে তাহার উপর। এখানের সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণী—হিমালয় পর্ব্বতমালার অন্তর্গত—তাই হিমালয়কে দেব-দেবীর আবাসস্থল বলা হয়। এই বৈরত পর্ব্বতে বৎসরের সর্ব্বসময় প্রচণ্ড হিমপ্রবাহ বহিতে থাকে—বহু কষ্ট সহ্য করিয়া স্বামী সত্যানন্দ ঐ স্থানে বহুদিন তপস্যা করিয়া মাতৃনামে লীন হইয়া দেহত্যাগ করেন। বিদেহী অবস্থায় ঐ পবিত্র স্থানে বহুদিন অতিক্রম করিয়া মাতৃ-আদেশে

পৃথিবীতে মাতৃনাম প্রচার করিবার জন্য সুদূর আমেরিকায় এক পবিত্র পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু মন পড়ে থাকে সেই সুদূর ভারতবর্ষে—হিমালয়ের কোণে কোণে—কাশীধামে এবং পৃথিবীর অন্যতম পীঠস্থান বক্রেশ্বর ধামে।

তিনি এখনও স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারেন—পৃথিবীর সর্ব্বদেশে কিভাবে—কিরূপে পৃথিবীর মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে—ভিন্ন ভিন্ন রূপে একই শক্তির পূজা করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের সহিত আত্মিক গাঁট ছাড়া বন্ধন বশতঃ বার বার তিনি প্রায় প্রতি বৎসর এই ভারতবর্ষে ছুটিয়া আসেন। ৺মাতা দুর্গা যে ব্রহ্মময়ী—পরমেশ্বরী—সকল দেবদেবীগণ যে তাঁরই রূপ পরিগ্রহ করিতেছেন—তাহা দেবী ভাগবতে পরিষ্কার বলা রহিয়াছে। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগ হইতে যে দেবী আরাধনার ধারাটির সূচনা হইয়াছিল, তাহা যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এখনও প্রবাহমান। সাহেব সাধুর পূর্ব জনমের স্মৃতি মনোমধ্যে এখনও জাজ্বলামান—পৃথিবীর কোণে কোণে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মের মানবগণ একই মাতৃশক্তিকে কিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে পূজা করিয়া আসিতেছেন—সকলের লক্ষ্যস্থল এক—সেই মাতৃ-শক্তির পূজা। কৃষ্ণ সাগরের তীরে রুশ দেশে শক জাতিরা এক প্রধানা দেবীকে পূজা করিতেন—তাঁর নাম ছিল তবিতি—এই দেবীই ছিল বাড়ীর ও পরিবারের গৃহদেবী।

হেস্তিয়া নাম্নি এক মূর্তি গ্রীকবাসীরা ভারতবাসীর লক্ষ্মী পূজার ন্যায় পূজা করিতেন ঘরে ঘরে—বাড়ীতে বাড়ীতে সংসারের মঙ্গল আকাঙ্খায়—এই হেস্তিয়া দেবী রোমকদের দ্বারা ভেস্তা নামে পূজিত হইতেন। গ্রীকরা নানা মূর্তিতে মাতৃ-শক্তির পূজা করিতেন

এবং যুদ্ধ-যাত্রার প্রাক্কালে তাঁরা দেবী এথিনীর বন্দনা করিতেন। প্রেমের দেবী এফ্রাদিতি, শিকার করিবার সময় আর্তিমিস—মাটিকে গাইয়া দেবী বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইতে ভুলতেন না।

হোমারের ইলিয়াস নামক কাব্যের উপাখ্যান হইতে জানা যায়—গ্রীক দেশের এক অংশের নাম থেসেলী। সেই রাজ্যের যুবরাজ পিলুসের থেটাস নাম্নি সাগরসম্ভবা এক দেবীর সাথে বিবাহ হয়। থেটিস দেবযোনী—সুতরাং তাঁহার বিবাহে সকল দেবী নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ স্থলে আর্বিভূত হন। হীরী জুশের পত্নী—অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের পত্নী শচী দেবীর ন্যায়, আথেনী, জ্ঞান দেবী সরস্বতীর ন্যায় এবং অপ্রোদীতি, প্রেমদেবী রতির ন্যায়। এই অপ্রোদীতি দেবীর আদেশ মতে রাজকুমার স্কন্দর বহু সংখ্যক সাগর যান—নানা ধন-দৌতল পাইয়াছিলেন। আবার দেবী অপ্রোদীতীর মায়াজালে হতভাগিনী রাণী হেলেনী রাজ-অতিথি স্কন্দরের প্রতি অনুরাগিনী হইয়া পতিব্রতা বিসর্জন দিয়া স্কন্দরের অনুগামিনী হইলেন। ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী মহামায়ার মায়া ছাড়া কিছুই নহে—মহামায়ার জালে সকলে আবদ্ধ।

পুণরায় প্রধানা দেবী হেরা—যাকে রোমকরা জুনো বলিয়া সংম্বাধন করিতেন—তিনি ছিলেন এক কল্যাণময়ী দেবী। অবিবাহিত নারীগণ নিজেদের রক্ষার নিমিত্ত এই দেবীকে ভার্জিনেন্সিস নামে এই দেবীর শরণ লইতেন। ভারতের দুর্গা পূজার ন্যায় বৎসরে একবার জুনো মাতার পূজার অনুষ্ঠিত হইত—যাঁহার পূজায় পবিত্র নারী ছাড়া কেহ যোগ দিতে পারিত না। গাছ-পালা, নদী-নালা, সমুদ্র-পর্বতের মধ্যে যে শক্তি নিহিত আছে রোমকরা তাঁহাকে ডায়েনা বা অরণ্যদেবী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন।

ফিনিসীয় ব্যক্তি সাধারণের মধ্যে প্রবাদ আছে দেবী এফ্রিদিত্তীর স্বামী এডনিস বহু যুগ ধরিয়া বহু অপূর্ব শিল্পকলা সৃষ্টি করেন। প্রভু এডনিস পৃথিবীর সবকিছু সৌন্দর্য্যময় শিল্পকলা সৃষ্টির ধারক ও বাহক। প্রেমের ও সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভেনাসের মূর্তি তিনিই পাথর খোদাই করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সৌমাররা ভারতবাসীর অনুকরণে মাতা ননাদেবীর পূজা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন—এই দেবীর বাহন সিংহ এবং ইনিই হচ্ছেন পর্বতবাসিনী পার্বতী। যুদ্ধভূমিতে সৈন্যদের পরিচালনা করিতেছেন এই দেবী—তাহা নানা শিল্পলিপিতে দেখা যায়। এই দেবীকেও ননা নামেও পূজা করার ইতিহাসও শুনা যায়।

ফিনিসীয় মন্দিরগুলিতে মিলিত্তা নামে এক প্রেমের দেবীর পূজার কথাও শুনা যায়—জনসাধারণের চক্ষে এই দেবী ছিলেন যৌন মিলনের কর্ত্রী।

তাছাড়া ফিনিসিয়রা অশতরেথ নামে এক দেবীর আরাধনা করিতেন—সূর্য্যদেবের অর্দ্ধাঙ্গিনী হিসাবে। সিরিয়াবাসীরাও এই অশতরেথ দেবীর পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন তাঁদের দেশে। এই দেবীর মন্দিরে নারীদের দেহ বিক্রয় করিয়া ভক্তির প্রদর্শন করিবার ইতিহাসও শুনা যায়।

গ্রীক দেবী আর্তিমিসের সহিত ননা দেবীর কিছু মিলন দেখা যায়—তাঁহার বাহন ভ্রমর—আর ভারতবর্ষে ৺মাতা দুর্গাকে ভ্রামরী বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেমিটিকরা আসলে প্রবল মাতৃ-ভক্ত ছিলেন এবং মাতৃশক্তিকে তাঁহারা ননা নামেই অভিষিক্ত করিতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে ঋকবেদে 'মা' শব্দের অর্থ ননা শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্যালেস্টাইনে 'অনৎ'

নামে এক দেবীর পূজার প্রচলন ছিল—ইনি ছিলেন প্রজনন শক্তির উৎস—এর কৃপায় মাতৃত্ব সহজে পাওয়া যাইত।

কিন্তু মিশরে এই দেবীর 'রণচণ্ডী' মূর্তি মাতা দুর্গার ন্যায় শোভা পাইত—হস্তে কুঠার, শূল, চর্ম ইত্যাদির দ্বারা শোভিত হইয়া। অল্লৎ নামে এক দেবী মূর্তির পূজার প্রচলন আরব দেশে ছিল—অযোনী সম্ভবা এই দেবী একাধারে ঈশ্বরী—অন্যধারে তেজস্বিনী বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

ঈষাতার নামে এক দেবীর পূজার কথা ব্যবিলীয়ন ও এসিরিয়াতে শুনা যায়—তাঁদের মতে ইনিই আদ্যাশক্তি—সৃষ্টি-স্থিতি ও লয় বা ধ্বংসকারিনী। এই দেবীর সহিত একজন পুরুষ সহচর সবসময় থাকিতেন—যিনি একাধারে দেবীর পুত্র, অন্যধারে পতি ও ভ্রাতা বলিয়া পরিগণিত হইত যেরূপ ভারতবর্ষে কাল-ভৈরবের ভূমিকায় একই জিনিস দেখা যায়। মাতা ঈষাতারের সাথে একদল পূজারিনীও অবস্থান করিতেন—যাঁহারা পেশায় পবিত্র বারাঙ্গনা বলিয়া সমাজে আদরনীয় হইত। ঈষাতারের মন্দিরে পর-পুরুষের নিকট দেহ বিক্রয় করিয়া এই পূজারিনীর দল অর্থ সংগ্রহ করিয়া পূজা-সামগ্রী যোগাইতেন এবং মন্দিরে পূজা চালু রাখিতেন। সমাজের নিকট এইসব নারীরা পবিত্র বারাঙ্গনা বলিয়া অভিহিত হইতেন।

এসিরীয়-ব্যবলনীয় সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইবার পর ইরাণীগণ বিজেতা হইয়া এই মাতৃশক্তিকে অনাহিত বলিয়া ইরাণী নারীর বেশে পূজা শুরু করিয়াছিলেন—কিন্তু ইরাণের প্রাচীন দেবীর নাম ছিল 'অনইতিস' ইরাণীরা সাধারণ ভাষায় অনাহিত বলিতেন।

সব থেকে আশ্চর্য্য বিষয় আর্মেনিয়নরা অচিলিসেন নামক এক প্রদেশে এই দেবী অনইতিসের পূজা করিতেন—বিবাহের পূর্বে নারীদের এই মন্দিরে বাস করিয়া পবিত্র বারাঙ্গনা ব্রত উদযাপন করিতে দেখা যাইত এবং যাহা গর্হিত কার্য্যের পরিবর্তে পবিত্র কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী—মানবদেহে অনাহত চক্র বলিয়া একটি চক্র রহিয়াছে—এই অনাহত চক্রে স্বর্ণবর্ণ শিবের মস্তকে একটি মণির ভেতর অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পবিত্র জীবাত্মা রহিয়াছেন—ষটচক্রের মধ্যে এই মহান পবিত্র চক্রে ভারতীয় যোগী ও সাধক-সাধিকাগণ মনোনিবেশ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তাই মনে হয়—এই অনাহিত দেবী এই ষটচক্রের অনাহত হইতে আসিয়াছে।

যে যাই বলুক না কেন মানবের নিজ জীবনকে বিকশিত করাই প্রধান লক্ষ্য—চিন্তাহীন কৌতুহল যুক্ত অজ্ঞানতা একটি পাপ ছাড়া কিছুই নয়—যাহা পশুরাই করিয়া থাকে। এই পশুত্ব ভাব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রবল প্রতিবন্ধক। উচ্চ আদর্শের সহিত আধ্যাত্মিকতা যুক্ত করিয়া জীবনকে সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে। স্বার্থের বশীভূত হইয়া মানুষ নীতিজ্ঞান হারাইয়া এই পবিত্র মাতৃশক্তি হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। মাতৃশক্তি জীবনের সকল কাজ করিতেছে—এই শক্তিধারা মানবের দেহ মনে সতত প্রবাহিত—অন্তর সত্যমুখী হইলে এই মাতৃশক্তিকে জানিতে পারে। অহংবুদ্ধি—দম্ভ, অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা মানুষকে এই মাতৃশক্তি হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। নিজকে ভুলিয়া মাতৃ-শক্তির বন্দনা করিতে পারিলে মায়ের তথা মাতৃসত্তার সন্ধান পাওয়া

যায়। যখন আমরা নিজের ও নিজ স্বার্থপরতার কথা ভাবি তখন ঐ মাতৃশক্তি মন হইতে বহু দূরে অবস্থান করে।

৺মাতৃশক্তির পেছনে যখন জীব চলিতে থাকে তখন সে প্রথমে দেখে—চারিদিক অন্ধকার, কিন্তু একমনে অন্যদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া মায়ের পেছনে চলিতে চলিতে সে প্রত্যক্ষ করে ঐ অন্ধকার ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছে—দেহ ও মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইতে থাকে। সুতরাং মাতৃ-সাধনা করিতে করিতে যখন আমরা চারিদিকে অন্ধকার দেখি—তখনই বুঝিতে হইবে ৺মাতা সামনে আলোক বর্ত্তিকা লইয়া আলো দেখাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—ইহাই ধৈর্য্য ও সংযমের জয়। প্রত্যেক মানবাত্মার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ—৺মাতা জগদম্বার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা যদি কেহ জীবন সার্থক করিতে চায়। বর্হিমুখী না হইয়া অন্তরমুখী হইলেই ৺মায়ের সন্ধান পাওয়া যায়—সামান্য তমভাবে প্রয়োজন বোধে বর্হিমুখী হইয়া সমস্ত মনকে গুটাইয়া অন্তরমুখী হইয়া ৺মাতার চরণে নিজকে নিক্ষেপ কর। এজগতে কেহ বুদ্ধিমান বা চালাক নহে—মানুষ কালের অর্থাৎ মাতৃশক্তির দাস—এই মহামায়া মানুষকে সময়মত চালাক ও বোকা বানাইয়া থাকেন। তাই বিগত জীবনে ও বিগত জন্মে ও এ জন্মে এই ধনীর দুলাল স্বামী সত্যানন্দ ধন-অহঙ্কার সবকিছু ত্যাগ করিয়া সারা বিশ্বে ভ্রমণ করতঃ বিভিন্ন প্রকারের মাতৃ-পূজা, বিভিন্ন প্রকারের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞাদি—বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান অর্জন করিয়া পূর্ণভাবে মাতৃ-সাধকে পরিণত হইয়াছেন।

বিগত জন্মের স্মৃতি এখনও তাঁর মনে—তাঁর স্মৃতি উদ্যানে থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে। বদরীনাথে দেহান্তের পরে স্বর্গপথে

যাইবার সময় সকল ঘটনা—সকল বস্তুর রসায়ণ প্রাকৃতিক দৃশ্য—দৈবিক দর্শন তাঁর মনে জ্বল জ্বল করিতেছে।

সাহেব সাধুর স্মৃতি পিঞ্জরে পূর্ব জন্মের মৃত্যুর পূর্বে ঘটিত হিমালয় ভ্রমণের ছবি এখনও সুস্পষ্টভাবে আঁকা রহিয়াছে। পদব্রজে সর্বপ্রথম তিনি আসেন হরিদ্বারে, হরিদ্বার হইতে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল রুদ্রপ্রয়াগ। সঙ্গমস্থল শোভা করিয়া রহিয়াছে জগদম্বা মন্দির—মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছেন রুদ্রনাথ। আরও একটু উত্তরে তিনি চলেছেন—যোশীমঠ বদরীর পথে। যোশীমঠ হইতে গোবিন্দঘাট—এখান থেকেই হেমকুণ্ড ও নন্দন-কানন যাইবার পথ রহিয়াছে—সারা পথে চড়ায় ও উৎরাই অতিক্রম করিতে হয়। হেমকুণ্ডর তীরে অর্থাৎ পূর্বে যেখানে মেধ মুনির আশ্রম অবস্থিত ছিল—সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তিনি বদরীনারায়ণ ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেইখানেই তপস্যার আসন পাতেন।

বদরীনারায়ণ ধামে তপস্যারত সমাধি অবস্থায় তাঁর দেহপাত হইলেও তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই—যে তিনি বিদেহী হইয়াছেন। যখন তিনি বুঝিলেন, তৎক্ষণাৎ ৺শিবসহ মাতা দুর্গা এক মনোহরণকারিনী দৃশ্য সম্মুখে প্রতিভাত হইল—এক মন্দির প্রাঙ্গণে তিনি উপবিষ্ট—সম্মুখে হাস্যমুখে মন্দির হইতে যুগল হর-পার্বতী তাঁহাকে সহাস্যবদনে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন—কিভাবে এই স্বর্গধামে তিনি আসিলেন তাহা জানিবার কৌতূহল জাগিল না। কুসুম আসনে বসি কেহ গাহে মধুর গীত—সুন্দরী অপ্সরাগণ স্বর্ণবীনা বেদন করিতেছেন—কেহ সদানন্দ মনে ফুলবনে প্রবেশ করিয়া সঙ্গীত তরঙ্গে নিজকে ঢালিয়া দিতেছেন—এ যে চির-

বসন্তের জায়গা—ঈশ্বর নেশায় সকল দেব-দেবী বুঁদ হইয়া রহিয়াছেন। মন্দির অভ্যন্তরে দেবীর দক্ষিণে কমলাসনে উপবিষ্ট—শান্তশিষ্ট প্রভু মহেশ। দেব-দেবীগণ স্তুতি করিয়া বলিতেছেন—হে প্রভু! হে জগৎ-জননী! জগতের আদি-অনাদি-সর্বজ্ঞ—কে বুঝে তোমাদের মহিমা? কিন্তু একি! মুখ দিয়ে ভাষা নির্গত হইতেছে না—অথচ এক প্রবল জিজ্ঞাসা অন্তর হইতে বেরিয়ে আসিতে চায়—তিনি গীতা-চণ্ডীর রহস্য জানিতে চান?

কিয়ৎক্ষণ পর চাহিয়া দেখেন যুগল-মূর্তি মণ্ডির হইতে অন্তর্হিত—তিনি কিছু বলিতে চাহিলেও—উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না। এহেন অবস্থায় দৈব-বানীর ন্যায় কোন এক মহাপুরুষ গীতার কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন। আমরা সাধারণতঃ একটি গীতার কথা জানি—কেবল ভগবদ গীতা—কিন্তু তিনি হরেকরকম গীতার কথা বলিয়া যাইতেছেন—যেমন গুরু গীতা, রাস গীতা, উত্তর গীতা, অনুগীতা, ব্রাহ্মণ গীতা, দেবী গীতা, অবধূত গীতা, পরাশর গীতা, পাণ্ডব গীতা, জীবন্মুক্তি গীতা, হংস গীতা, শ্রীসপ্তশ্লোকী গীতা, পৃথিবী গীতা, হারীৎ গীতা, ব্যাস গীতা, গোপী গীতা, বৈষ্ণব গীতা, পিতৃ গীতা, ভীষ্ম গীতা, যম গীতা, গীতা সার, তুলসী গীতা। দেবী গীতার প্রাসঙ্গিকীকেতে তিনি বলিতেছেন—এই দেবী গীতা দেবী ভাগবতের অন্তর্গত উপদেশাবলী। তারকাসুরকে বধ করিবার সময় দেবতারা জগন্মাতার শরণাপন্ন হইলে—দেবী হিমালয়কে শক্তিময়ী গৌরীর আবির্ভাবের আশ্বাস প্রদান করেন। দেবতাগণ দেবীর মহারূপ দেখিতে লাগিলেন—দেবীর মূর্তি হইতে হাজার হাজার অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে—দেবী তাঁহার লোল জিহ্বায় দ্বারা জগৎকে আস্বাদ করিতেছেন। দন্তে দন্তে ঘর্ষণে

বিরাট আওয়াজ—অস্ত্রধারী বহু সৈন্য ও বীর সেনানী তাঁর অঙ্গ-স্বরূপ হিমালয় কন্যা হৈমবতী জন্মগ্রহণ করেন গৌরী নামে—তাঁর উদরে মহাবীর কার্ত্তিকের জন্ম হয়—এই বীর কার্ত্তিকের তারকাসুরকে বধ করিয়া দেবতাদের রক্ষা করেন। এই গীতাটি রাজা জন্মেজয়কে স্বয়ং ব্যাসদেব শুনাইয়াছিলেন এই গীতার তাৎপর্য্য—জন্ম-মৃত্যু-জরা এই তিন প্রবাহ লইয়া সংসারের গতি চলিতেছে—অনন্তকাল ধরিয়া। সংসারের প্রধান কারণ অজ্ঞান ও অবিদ্যা।

অজ্ঞানতাকে বিনাশ করিতে পারিলেই জীব জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারেন। জ্ঞানের উদয় হইলে কামনা-বাসনা মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

দেবী হিমালয়কে বলিতে থাকেন—"হে গিরীবর! 'তত্ত্বমসী' তৎ পদের অর্থ আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, সর্বেশ্বরী—ত্বং পদের অর্থ জীব। ব্রহ্ম ও জীব এই দুইটি শব্দ পরস্পর বিরোধী। জীব ধর্মতঃ সর্বজ্ঞ ও সর্বগত নয়—অন্যদিকে ঈশ্বরে সর্বজ্ঞ ও সর্বগত।

সর্বজ্ঞ-সম্পন্ন ব্রহ্ম চৈতন্যই ঈশ্বর—আর অজ্ঞান গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যের অভাবই জীব। কারণ জীব সর্বজ্ঞ নয়—ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। দেবী গিরিরাজকে বলিতে থাকেন যে জীবের পাঁচটি কোষ আছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। এই পাঁচটি কোষ ত্যাগ করিলেই ব্রহ্মলাভ হইতে পারে। আত্মার জন্ম-মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই—ইনি জন্ম রহিত—সনাতন ও শাশ্বত—বিনাশহীন, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মহান হইতে মহত্তর এই আত্মা। হে পর্ব্বরাজ! হ্রীংকার বাচ্য-বাক্য আদি তত্ত্ব—এই আত্মা থেকেই শব্দ তন্মাত্রা— আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে

পৃথিবী উৎপন্ন হয়। পাঁচটি সূক্ষ্ম মহাভূত হইতে সবকিছুরই উৎপত্তি হইয়াছে—যাহাকে কারণ দেহ বলা হইতে পারে। ৺মাতা বলিতে থাকেন—হে গিরিরাজ! সত্য, মন, প্রাণ, বাক্ বিশিষ্টা অমৃতা-স্বরূপা আমাকে জানিও। আমি সে অক্ষর ব্রহ্ম। আত্মাকে ধ্যান করার পথকে ওঙ্কার সাধনা বলা হয়—আত্মা সেখানে বহুরূপে বিরাজ করিতেছে। আত্মাকে জান—অনাত্মকে ত্যাগ কর—তোমাদের কল্যাণ হইবে। ঋষি, সংযমী, পবিত্র ব্যক্তিরা অনুভূতি দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পান। জ্ঞানীরা আত্মাকে জ্ঞানীদের নিকট আত্মা—আনন্দস্বরূপ। বিপদ মোচনকারী এই ব্রহ্মবিদ্যাকে সংযমী ও নিষ্কামী হইয়া ত্যাগ-তিতীক্ষার দ্বারা জানিবার চেষ্টা কর।

শ্রীমদভাগবদ গীতার প্রাসঙ্গিকীতে দেখা যায় যে মহাভারত গীতার আকারে বেদের জ্ঞানের সারাংশ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ মুখনিসৃত বাণী—তাই গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে পাণ্ডব সেনাপতি অর্জুন—যাঁর সারথী স্বয়ং কৃষ্ণ—সর্বাগ্রে পিতামহ ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া ব্যথিত চিত্তে করুনভাবে বলিতে থাকেন শ্রীকৃষ্ণকে—

"কার সাথে করি রণ—কাহারে সংহার করিব
আত্মীয়-স্বজনসহ গুরুকে মারিতে নারিব।"

অর্জুনের দেহ কম্পমান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথীল, গাণ্ডীব হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতে চায়। অর্জুনের মনোভাব বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে বলিতেছেন—হে পার্থ! ভীরুতা বীর পুরুষের শোভা পায় না। প্রত্যুত্তরে অর্জুন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন...."হে প্রভূ! এই মুহুর্ত্ত হইতে আমি আপনার শরণাগত হইতেছি—আপনি আমাকে শ্রেয়োজনক উপদেশ দান

করুন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিতে লাগিলেন—"কে কারে মারিতে পারে, কে বা কার অরি—সবারে সংহার করি, আমি সব করি।" সর্ব্বঘটে স্থিতি মোর—আত্মারূপে সমান রহি সবার শরীরে। মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই—কেবল পোষাকের বা বস্ত্রের পরিবর্ত্তন। শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনাশ নাই—এক দেহ দাড়ি অন্য দেহে গমন মাত্র। আত্মা অগ্নিতে পুড়ে না—জলে ভিজে না—অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করা যায় না।

"হত সব বস্তু দেখ চরাচর মাঝে—
আমার স্বরূপ তাহা জানাই তোমাকে।"

মুখব্যাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোটা বিশ্বকে তাঁহার শরীর অভ্যন্তরে দেখাইতেছেন—কুরুক্ষেত্রে মৃত বীরগণকে। শ্রীকৃষ্ণ অবয়বে নিখিল বিশ্বের একত্বের ছবি দেখিয়া অর্জুন যেরূপ আনন্দিত—সেইরূপ বিধ্বংসকারী সংহার মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভীতপ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

পৃথিবীর জীবন প্রবাহ কীট-পতঙ্গের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে ও দন্ত দ্বারা নিষ্পেষিত হইতেছে দেখিয়া অর্জুন স্তম্ভিত ও বিস্মিত। একধারে আনন্দিত অন্যধারে বিভীষিকাময় প্রলয়ের চিত্র। এবার শ্রীঅর্জুন বুঝিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিশ্বের পরম আবাস ও আশ্রয় স্থল। যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশগুলি দিয়াছিলেন—তাহারই সারাংশ হচ্ছে এই শ্রীমদ্-ভাগবত গীতা।

তাই গীতার মঙ্গল ধ্যানে উপনিষদগুলিকে গাভীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে—দুগ্ধ দোহন কর্ত্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং বৎস শ্রীঅর্জুন—আর শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিসৃত বাণী অমৃতময়ী গীতা।

মহাজ্ঞানী দত্তাত্রেয় দ্বারা রচিত অবধূত গীতা প্রসঙ্গে—তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে—তাহাই সবই আত্মা—যাহা কিছু দৃশ্যমান দেখিতেছে—তাহাই আত্মার প্রতিচ্ছবি নারী হইল সেই মনোমোহিনী—সেই মায়া—এই মায়ার ফাঁদে পা দিয়ো না।

যোগেই মুক্তি—ভোগেই বন্ধন। সুস্থ চিত্তে, সংযম যোগে, পরম সত্যকে জানিবার প্রক্রিয়ার নাম অবধূত গীতা।

তুলসী গীতা—এই গীতাতে তুলসীর মহিমা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঈশ্বর যে যে স্থানে গমন করেন—অবস্থান করেন—তাহাই তুলসী কানন তুল্য। স্বয়ং নারায়ণ তুলসীর স্তব ও প্রশস্তি করিয়াছেন—তিনিও তুলসীর প্রসাদ চান। শঙ্খচূড় তুলসী এবং নারায়ণকে লইয়া একটি প্রতীক কাহিনী প্রচলিত আছে।

তুলসী একাধারে বায়ু শোধন করে—অন্যধারে পাতার রস, মঞ্জরী, কাণ্ড—শিকড় ঔষধি স্বরূপ।

গর্ভ গীতা প্রাসঙ্গিকীকেতে বলা হইয়াছে—জন্ম-মৃত্যুকে কিভাবে অতিক্রম করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মধ্যে এবিষয়ে যাহা আলোচিত হয়—তাহা লইয়া গর্ভ গীতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। গর্ভের অন্ধকার হইতে বেরিয়ে আসা ও জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণায় হাত হইতে অব্যাহতি কিভাবে পাওয়া যায়—সেই রহস্য এই গীতার শিক্ষা হইতে জা।যায়।

কর্ম মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও ফলভোগ করায় এই কাম-ক্রোধ লোভের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইতে সেইরূপ উত্তম কর্ম করা দরকার। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন—উত্তম কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে চিৎভাবের উদয় হইলে পার্থিব কামনা-বাসনার লোপ পাইয়া

জ্ঞানের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। জীবের পাপ অগ্নিতে পুড়িয়া খাক হইয়া যায়—আর পুণর জন্মের সম্মুখীন হইতে হয় না। কর্ম অনুযায়ী মৃত্যুর পর শুক্লাগতি ও কৃষ্ণাগতি হইয়া থাকে। শুক্লাগতিতে জীবের পুণরজন্ম হয় না—কৃষ্ণাগতি প্রাপ্ত হইলে জীবকে পৃথিবীতে পুণরজন্ম লইতে হয়—পুণরায় মাতৃ জঠরে ক্লেদ হলে নিমজ্জিত থাকিয়া জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য। জীবন্মুক্তি গীতার প্রাসঙ্গিকীকেতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে জ্ঞানী মাত্রই মুক্তির কামনা করিয়া থাকেন—জন্ম-মৃত্যু-ব্যধি যাহাতে ভোগ করিতে হয় না। মৃত্যু হয়তঃ সাময়িক মুক্তি দিতে পারে—কিন্তু ফের জন্ম লইয়া শরীর ধারণ করতঃ জ্বরা-ব্যধি ও কামনার শিকার হইতে হয়।

মহাজ্ঞানী দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন—ঘূর্ণিয়মান এই পৃথিবীর বক্ষে তিমির অন্ধকার মাত্র সূর্য্য লোকের অন্তরাল। সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধাকাশে বিরাজ করেন—নিত্য—তাঁহার উদয় ও অস্ত নাই। মৃত্যুও সেইরূপ সংসার চক্র জীবনের অন্তরাল মাত্র আত্মার জন্ম-মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। এই জীবসত্তার সহিত দুঃখ-কষ্ট যেমন জড়াইয়া আছে তেমনিভাবেই মুক্তির দ্বারও খোলা রহিয়াছে। জীবনকে বাদ দিয়া মুক্তির আলাদা অস্তিত্ব নাই। অনাহত চক্রে চিদাকাশে হৃদয়াকাশে ব্রহ্মস্বরূপিনী পরমাত্মা যখন নির্বিকারভাবে কর্মজনিত দেহের সুখ-দুঃখ পাইতে থাকিবে এবং এই ভাব লইয়া স্থিরচিত্তে সবকিছু সহ্য করিয়া যাইবে—তক্ষুনি সে হইবে জীবন্মুক্ত।

চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব যখন মানুষ বুঝে উঠতে পারে—তখন জীবন্মুক্ত পুরুষে রূপান্তরিত হয়। হৃদয়স্থিত আত্মা মনকে প্রকাশ করিতেছে—তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। শিবশক্তি যেমন একই

আত্মা সেইরূপ জীবের দেহপিণ্ড একটি ছোট ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া প্রতীত হয়—যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে—এই চিন্তা লইয়া তিনি ব্রহ্মকে চিত্তে লীন করিতে পারেন—তিনিই জীবন্মুক্ত।

ঈশ্বর গীতা—প্রাসঙ্গিকীকেতে—ব্যাসদেব দ্বারা জ্ঞানের পরিবেশন এবং জ্ঞানের মহিমার কীর্ত্তন করা হইয়াছে—ঈশ্বর গীতাতে দেবাদিদেব মহাদেবকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। মানুষ যখন সকল বস্তুর মধ্যে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করে তখনি ব্রহ্মজ্ঞান জন্মায় অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে নিজকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্ম চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্যক্তি সত্ত্বার মাধ্যমে অতিক্রম করিয়া পঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে ঠেলিয়া দিয়া—নির্বিকার শিবসত্ত্বা লাভ করিয়া থাকে।

এবার গীতার ব্যাখ্যা শেষ করিয়া মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে দৈববাণীর ন্যায় চণ্ডী মাহাত্ম তিনি শ্রবণ করিতেছেন। ভগবত গীতা মায়ের হিরন্ময় মন্দিরের ভীৎ—মনোময় কোষের সাধনা। চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম তাহার উপরে এক অতুলনীয় তাজমহল—অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা ও অনুসন্ধান। চণ্ড শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপণ—মাতৃ-স্নেহে লালিত পালক সন্তান চণ্ডিকা মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হন—কারণ প্রতি কার্য্যে সে মাতৃ-স্নেহের নমুনা দেখিতে সমর্থ হন। আপদ-বিপদ সুখে-দুঃখে জন্ম-মৃত্যুতে সর্ব্বত্র মায়ের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ বুঝিয়া সে মাতৃ-আবেশে পাগল হইয়া যায়। জীবগণ কামনা-বাসনার অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে—কিন্তু যাঁহারা মাতৃ-অভিমুখী যাত্রী তাঁহারা মাতৃ অনুগ্রহ লাভে ব্যস্ত। তাই তাঁহারা শক্তিলাভের প্রয়োজন বুঝিয়া শক্তিলাভ না করিয়া চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করে না। কীলক শব্দের অর্থ বাধা আর অর্গলা।

স্তোত্র অর্থে বহুমুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করা। একাদশ রুদ্র অর্থে বুঝায় অন্তকালে যিনি সকলকে কাঁদাইয়া থাকেন। মন এই একাদশ রুদ্র মায়ের নিকট যাইবার একটি অন্তরায়—একটি অর্গল বা রুদ্ধদ্বার।

পঞ্চভূত—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রীয়—পঞ্চকর্মেন্দ্রীয়, মন ও একাদশ রুদ্র ইহারাই আমাদের শত্রু—ইহারাই "আমি কে"? বুঝিতে দেয় না। চণ্ডীতে পরমাত্মাকে মহামায়া হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—তাই পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন কীলক অর্থাৎ বাধা—মাতৃমুখী গতিকেই মনোভূমিতে প্রবেশের এই অর্গল খুলিতে পারিলেই মানব মাতার স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হয়।

মধুর অর্থ আনন্দ, কৈটভের অর্থ বহুত্ব। সাধক। তুমি মাতৃ-চিন্তায় নিজকে নিয়োজিত করিয়া দেখিতেছ—জাগতিক ভাবরাশি তোমার মাতৃ-চিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে সেই পরম্ ভাবগুলিকে লক্ষ্য করিয়া—সত প্রতিষ্ঠা করিয়া চঞ্চলা মাতৃ-পদে নিজকে সমর্পণ করিতে ভুলো না। মাতা আসিলেই চিত্ত আপনা-আপনি স্থির হইয়া যাইবে। এই জীব-জগৎ মহামায়ার সন্তান মাত্র—তাঁহার কোলে আমরা নিয়ত: অবস্থান করিতেছি। শক্তি বা মায়া অসত্য নহে—ভুল নহে, উহা সত্য। ব্রহ্মের প্রকাশই এই শক্তি বা মায়া। জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী অনুভূতির বিকাশ হয়—যে যেরূপ চক্ষু বা জ্ঞান পাইয়াছে সে সেইরূপ ভাবে বিচরণশীল হইয়া তদনুরূপ অর্থ গ্রহণ করেন।

সবর্ণা দেবীর গর্ভে সূর্য্য জন্ম হয়েছে মনু সর্গ। অর্থাৎ সৌরশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি। মন ধাতুর অর্থ বোধ বা জ্ঞান। সবর্ণার গর্ভজাত সন্তান এই মনু সাবর্ণি নামে খ্যাত। সমস্ত মনুষ্য জাতির ব্যষ্টি চৈতন্যে সমষ্টির নাম মনু।

মার্কণ্ডেয় অর্থ প্রাজ্ঞ বা জ্ঞানী পুরুষ। জৈমিনির অর্থ বিশ্ব অথবা জীব। মহামায়ার ইচ্ছায় মনুত্ব লাভ করা যায়। মনুষ্য-জাতি মনুরই হৃদয়। মহামায়া কি? আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ তাঁকে লাভ করা। গর্ভধারিণী মাতার নিকট "মা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া যখন মানুষ মাতার নিকট গমন করে—তাহা শুধু স্নেহের ধারায় নিজকে অভিষিক্ত করিবার আশায়। জগজ্জননীকে সামনে দেখিয়া মনুষ্যগণ সেইরূপ স্নেহের ধারায় অভিষিক্ত হইবার আশা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া থাকে। এই মহামায়া জীবের জননী—মহামায়াই ঈশ্বর—মহামায়াই ব্রহ্ম।

বহু পরে প্রকাশিত হইবার জন্য নির্গুন—চৈতন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন—অর্থাৎ মায়ারূপে আবির্ভূত হন। আবার জগৎ হইয়া অব্যক্ত বস্তু সমূহকে প্রসব করিয়া নির্গুনত্বে উপনীত হইবার জন্য শক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ঐ দ্যাখ—কাম—ক্রোধ—মোহ—মাৎসর্য্যরূপে মা—
ঐ দ্যাখ বাল্য—যৌবন—বার্দ্ধক্যরূপে মা—
জন্ম-মৃত্যুরূপে মা—উনিই সেই মহামায়া।
বন্ধনরূপে ঐ মা—কামিনীর অঙ্গরূপে ঐ মা—
ভোগ সামগ্রীরূপে ঐ মা—তোমার সম্মুখে উপস্থিত
তবুও তুমি মাকে চিনিতে পারিতেছ না?
উনি মিথ্যা নহেন—জড় নহেন—উনি আত্মা—
উনিই সেই মহামায়া মা।

খুলতে পারো যদি ভাবের ঘরের চাবি—
দেখতে পাবে মায়ের হরেক-রকম ছবি।
চাবি খোলার আছে তোমার দাবী।

পুত্র-কন্যা, বন্ধু ও ভৃত্যের সামনে তোমার স্ত্রী দণ্ডায়মান। কে কিভাবে তোমার স্ত্রীকে দেখিতেছে?

পুত্র-কন্যার নিকট মাতৃ ভাব—
তোমার সামনে স্ত্রী ভাব—বন্ধুর সামনে কাম ভাব—
ভৃত্যের সামনে প্রভূ-পত্নী ভাব।

হে সাধক! যখন জাগতিক ভাবরাশি তোমার চিন্তার পথ বোধ করিতেছে—তখন সেই ভাবটিকে 'মা' বলিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা করিও—ছদ্মবেশী মহামায়া বা মাতৃজ্ঞানে আদর করিলে ইষ্ট মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। পুণঃ পুণঃ ব্যর্থ হইয়াও 'মা' বলিয়া ঐ ভাব-টিকে আদর করিতে ভূলিও না।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিলে বুঝিতে পারিবে ঐ ভাবরূপিণী মাতা তোমাকে ভাবাতীত ক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছেন—মাতৃদর্শন হইবে।

সরল শিশুর ন্যায় 'মা' 'মা' বলিয়া আকুল হইয়া মাকে স্মরণ কর—মাকে উপলব্ধি করিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ মায়ের চরণে নিজকে নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে তোমার অন্তর রাজ্য স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ও ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উপচে পড়িতেছে। দিবারাত্রি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা ভোগ করি—চিন্তা করি—সবই ভাব মাত্র। ভাবই মনের ধর্ম—পরিদৃশ্যমান পৃথিবী তোমার অন্তর মাত্র। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—এ জগৎ কল্পনা মাত্র—আর কল্পনা মনের ধর্ম—তাহা অন্তরেই অবস্থান করে। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন—যে মায়ের ভাব অসীম—অনন্ত এবং মনের ভাব ক্ষণস্থায়ী।

চণ্ডীতে সুরথ রাজা একজন অধিপতী বা নৃপতি, অন্যধারে একজন সাধক জীবাত্মা।

"আত্মাণাং রথিণং বিদ্ধি দেহেন্তু রথমেব চ" —আত্মা রথী—দেহ রথ। জীবাত্মার দেহ রথখানি সুন্দরভাবে সজ্জিত হয় যখন—তখনি জীবকে সুরথ বলা যাইতে পারে—জীব সুরথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে সুরথ না হইলে মনু হওয়া যায় না। একমাত্র মহামায়ার আশীর্ব্বাদে সুরথ ও মনু হওয়া যায়।

মেধস মুনির আশ্রমে চণ্ডীতে যে সুরথ রাজারও সমাধি বৈশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে তাহার অন্তরনিহিত অর্থ মহামায়াকে জানিবার জন্য আকুলতা আসিলে মেধসের ন্যায় (জ্ঞানের ন্যায়) ব্রহ্মজ্ঞ গুরু লাভ হইয়া থাকে। সকলপ্রকার সন্দেহের উর্দ্ধে যাইয়া মহামায়ার স্বরূপ জানিতে সক্ষম হয়।

সুরথ রাজা মেধস মুণিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন— আপনি যে মহামায়ার কথা বলিতেছেন—তিনি কে? আধ্যাত্মিক কোণ হইতে দেখা যায়—জীবাত্মা সমাধিস্থ হইয়া (এখানে সমাধি বৈশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে) শুদ্ধ বোধে অবস্থান করিতে পারিলেই মহামায়ার সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া যায়। সুরথ কহিলেন তাঁহার স্বরূপ কি? ঋষি উত্তর দিলেন—জগৎই তাঁহার স্বরূপ এবং তাঁহার স্বভাব—"ত্বয়া সর্ব্ব মিদং ততং"—এ জগতে তিনি পরিব্যপ্ত নিত্য-অবস্থায়—ব্রহ্মমায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

তিনটি আমির এখানে সন্ধান পাওয়া যায়—জীব আমি—ঈশ্বর আমি এবং পরম আমি। পরম আমির নাম "যঃ" এবং অহং উভয়ে মিলিত হইয়া ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়—এই মিলনের দ্বার সমাধি।

সমাধি জীবকে "সোহহং" বলিয়া পরিচিত করিলেন। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি উভয়ে নিজদের আত্মীয়দের দ্বারা বিতাড়িত

হইয়া বনবাস করিতেছিলেন (এখানে আত্মীয় বলিতে দেহের ইন্দ্রিয়গণকে নির্দেশ করিতেছে)।

সোহহং জ্ঞানের নাম সমাধি। মেধস অর্থে জ্ঞান বুঝাই—যে সমস্ত সাধক হতাশ হইয়া মেধসের (জ্ঞানের) আশ্রয় নেন—মেধসের ন্যায় গুরুর আশ্রয় পান—তিনি মহামায়া ব্রহ্মময়ীর সন্ধান পাইতে পারেন। সমাধি হইলেই ধ্যান—ধারনা—যম্—প্রত্যাহার সবকিছু আপনি হইতে আসিবে। সমাধি বৈশ্য চান মাতৃ-মিলন কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ তাঁহার এই মাতৃ-মিলনের বিরোধী। সমাধির সন্তান ধ্যান—স্ত্রী ধারনা—কেবল মাতৃ-অস্তিত্বের বিশ্বাসবান হইলে স্বয়ং সমাধি উপস্থিত হন। সকলের ন্যায় আমরা এক-একজন সমাধি বৈশ্য— ধনী পরিবারে জন্ম এবং ধনলোলুপ স্ত্রী-পুত্র কর্ত্তৃক সংসারে বিতাড়িত।

সুরথ রাজারও ঐ একই অবস্থা—স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কর্তৃক পরিত্যক্ত। মনোদুঃখে বনবাস করিতে থাকেন—ভাগ্যক্রমে মাতৃ-কৃপায় মেধস মুণির সাক্ষাৎ পাইয়া মহামায়ার কৃপা লাভ করেন। মেধস মুণির আশ্রমে রাজা সুরথ একদিন সমাধি বৈশ্যকে দেখিতে পান—ইহার অন্তরনিহিত অর্থ হইতেছে—জীব দেহের ইন্দ্রিয়গুলি হইতে কিভাবে মুক্তি পাইবে—মাতৃ অঙ্কে স্থান পাইবে এই চিন্তা মনোমধ্যে উৎকণ্ঠিত হইলে মা এই সমাধি বৈশ্যের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। বিশধাতু হইতে বৈশ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে—অর্থাৎ মাতৃ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত এইরূপ ব্যক্তিকে বৈশ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু সাথে সাথে মনে রাখা দরকার আত্মা বা দেহের জাতি নাই—গুণ ও কর্ম ভেদে জাতির ভেদ হইয়াছে—সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ণ করিবার অভিপ্রায়ে—বর্ণ বৈচিত্রের অব-তারণা করা হইয়াছে।

"মৎ পূর্বে, পালিতং পূর্বং ময়াহীনং পুরংহিত্য মদ-ভৃত্যৈ স্তৈর সদ্ বৃত্তৈ ধর্মতঃ পাল্যতেন বা" অর্থাৎ পূর্বে আমার ব্যক্তিগণ যে পুরকে পালন করিতেন—সেই পুর এখন আমার দ্বারা পরিত্যক্ত—সেই পুরকে আমার অসৎ ভৃত্যগণ কি ধর্ম অনুসারে পালন করিতেছে ? ইহার অর্থ রাজা সুরথ প্রারব্ধবশতঃ চিন্তা করিতেছেন দেহের মমত্ব বুদ্ধির আকর্ষণে। এখানে পুর অর্থ দেহ। সুরথরূপী এই জীবাত্মা দেহপুর ত্যাগ করিয়া এখন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু বহু জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত দেহাদির আকর্ষণ ও মমত্ববোধ এখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

যতদিন চণ্ডীতত্ত্ব সম্যকভাবে হৃদয়ে উদীত না হয়—ততদিন শুভ-বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না। আমার ভৃত্যগণ অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয়গণ আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই পুরকে অর্থাৎ দেহকে ধর্ম অনুসারে পালন করিতেছে কি না ? পূর্ব জন্মের দেহবোধ অনুযায়ী নয়া জন্মে দেহ গঠিত হয়—তাই মৎপূর্বে পালিতম্ এখানে বলা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রস-বিষয়সমূহ বহন করিয়া আনিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

এখানে একটি রাজ্যের সাথে দেহকে তুলনা করা হইয়াছে। সুরথের ভাগ্য চক্রাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া জীবনের অবসান মুহূর্ত্তে—মাতৃ দর্শনের আকাঙ্খা প্রবলভাবে সাড়া দিয়াছে। প্রকৃতি ও ভাব বিরোধী প্রজা বিরোধী তার জন্য তাঁহার আকাঙ্খাকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে—তাই ভাগ্যের জোরে মেধসের আশ্রমে মেধসের স্পর্শ পাইয়া সত্যের দ্বারে পৌঁছিতে পারিয়াছেন।

জীবাত্মা সমাধির মধ্য দিয়া শুদ্ধ বোধরূপী গুরুর নিকট হইতে মহামায়ার স্বরূপ এবং স্বভাব অবগত হইয়া তাঁহার আবির্ভাব ও কার্য্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছেন। সমাধিস্থ হইলে সবকিছুর সন্ধান পাওয়া যায়—তাহাই সবিকল্প সমাধি। "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি তস্মিন দৃষ্টে"—সাধক মাতৃ-চরণে নিজকে উজাড় করিয়া দেবার ফলে হৃদয় গ্রন্থির সম্যকভাবে উচ্ছেদ করিবার জন্য স্বয়ং মা আবির্ভূত হন—গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় মহামায়া মা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেন—তাহাই চণ্ডীর রহস্যময় আখ্যান। মধু-কৈটভ নিধন—ব্রহ্ম গ্রন্থি ভেদ, মহিষাসুর নিধন—বিষ্ণু গ্রন্থি ভেদ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—রুদ্র গ্রন্থি ভেদ—এই তিন গ্রন্থি ভেদ করিয়া সাধক মাতৃ-সন্নিধানে অবস্থান করিয়া দেবাসুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। তখন জীব অবলোকন করেন যে স্বয়ং মাতা অসুর ভাবসমূহকে নিজ শরীরে সমূলে বিলয় করিতেছেন—সাধকের নিকট মাতা চণ্ডী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া সাধকের জীবন সার্থক করেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর দৈববাণী শেষ হইবার মাত্র স্বামী সত্যানন্দ দেখেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে মন্দিরটি পরিবর্ত্তিত হইয়া গীর্জ্জায় পরিণত হইয়াছে—ক্রসবিদ্ধ মহাত্মা যীশুর মূর্ত্তি গীর্জ্জার অভ্যন্তরে শোভা পাইতেছে। সাথে সাথে যীশুর উপদেশাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গীর্জ্জা অভ্যন্তরে ও বাহিরে ধ্বনিত হইতেছে—হে যীশু সন্তানগণ! তোমরা যখন প্রার্থনা করিবে তখন বলিও—হে প্রভু! তোমার নাম পবিত্র বলিয়া গণ্য হউক। এই প্রভুই তোমার প্রতিদিনের খাদ্য পাঠাইতেছেন—আর বলিও আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করা হউক। আমি তোমাদের বলিতেছি—যাচ্ঞা করিলে—অন্বেষণ করিলে যীশুকে নিশ্চয়ই পাইবে। কেহ রুটি চাহিলে তাহাকে

পাথর দিওনা। তোমাদের সন্তানদের দান করিতে শেখাও। বিরাম-বিহীন দৈব্যবাণী হইতেছে—

1. Blessed are the poor in spirit for theirs in the kingdom of heaven.
2. Blessed are they that mourn for they shall be comforted.
3. Blessed are they which do hunger and thirst after righteous ness for they shall be fitted.
4. Blessed are the meek for they shall inherit the Earth.
5. Blessed are the merciful for they shall obtain mercy.
6. Blessed are the poor in heart for they shall see god.
7. Blessed are the Peace-Makers for the shall be called for the children of God.
8. You are the light of the world. A city that is set on the bill cannot be bid.

এই সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাষণের কম্পন পর্ব্বত মালার মধ্যে প্রতিহিত হইয়া নূতন করিয়া কম্পন সৃষ্টি করিয়া বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে—জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের শান্তি প্রদান করিতেছেন।

প্রিয়তমেরা! আইস আমরা পরস্পর প্রেম করি—কারণ প্রেম ঈশ্বরের—আর যে প্রেম করে—তিনি ঈশ্বরকে জানেন। যে প্রেম করে না তিনি ঈশ্বরকে জানেন না—ঈশ্বরের অপর নাম

প্রেম। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশিত করিবার জন্য মহাত্মা যীশুকে প্রেম করিতে পাঠাইছেন স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বরই শান্তি—তাই শান্তির বাণী ও ত্যাগের বাণী লইয়া যীশু আজ পৃথিবীতে অবতীর্ণ। যদি কেহ বলে ঈশ্বরকে প্রেম করি কিন্তু ভ্রাতাকে ঘৃণা করি তবে সে মিথ্যাবাদী—কারণ ভ্রাতাকে যে প্রেম করে না—সে ঈশ্বরকে প্রেম করিতে পারে না। পৃথিবীতে এক যীশু যান অন্য যীশু আসেন—কারণ সত্য, প্রেম ও শান্তির বাণী কে মানবগণকে শুনাবেন? একজন প্রোফেট দেহ ত্যাগ করেন অন্য প্রোফেট জন্মায়। এইভাবেই এসেছেন স্বামী সত্যানন্দ স্বামী পৃথিবীতে ঈশ্বরের তথা মায়ের বাণী—মায়ের স্বরূপ—মায়ের মহিমা আমাদের মধ্যে পরিবেশন করিবার জন্য। ঐ হ্যাথ—ধ্যান মগ্ন সত্যানন্দ স্বামী—মানবকূলে জন্ম লইলেও আসলে তিনি ঈশ্বরের দূত স্বয়ং মহামায়ার দূত—৺মহামায়ার প্রিয় পুত্র।

বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন অবয়বে একই ঈশ্বর ভুনিয়ার সর্বত্র লীলা করিতেছেন—একই ঈশ্বর স্ব-ইচ্ছায় বহু হইয়া বহু অবয়বে, বহু জাতির মধ্যে, বহু ধর্মের মধ্যে, বহু রূপ ধারণ করিয়া একই প্রেম, শান্তির ও সত্যের বাণী পরিবেশন করিতেছেন। স্বর্গকে কেহ বলিতেছেন Heaven, কেহ বলিতেছেন স্বর্গ, কেহ বলিতেছেন বেহেস্ত, নরককে কেহ বলিতেছেন হেল, কেহ বলিতেছেন নরক, কেহ বলিতেছেন দোজখ, আত্মাকে কেহ বলিতেছেন Soul, কেহ বলিতেছেন আত্মা, কেহ বলিতেছেন রূহ, রু, কেহ বলিতেছেন Devil, কেহ বলিতেছেন শয়তান, বলিতেছেন ভূত-প্রেত আসলে সবই এক। বার বার জন্ম লইয়া জগতের হিতার্থে জগতের মঙ্গলার্থের জন্য তোমাদের সম্মুকে বসিয়া আাছেন

স্বামী সত্যানন্দ—তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর। তিনিই যীশু পুত্র, তিনি মহামায়ার প্রিয় পুত্র, তিনিই ঈশ্বর পুত্র।

তোমাদের ভেতরে মতৈক্য থাকিতে পারে কিন্তু মনৈক্য যেন না থাকে। তোমাদের মধ্যে যেন দলপ্রেম না থাকে, দেশ প্রেমে তোমরা নিজেদের সমর্পণ কর। তোমরা সকলে সমমনা, পর দুঃখে দুঃখিত ও বিগলিত হও, ভ্রাতৃ-প্রেমি, স্নেহবান ও নম্র মনা হও। নিন্দার পরিশোধে নিন্দা করিও না— হিংসার পরিশোধে হিংসা করিও না।

সুপ্তোত্থিত বিদেহী সাহেব সাধু স্বর্গের স্তরে স্তরে পরিভ্রমণ করিয়া স্বর্গের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছেন—স্বর্গধাম পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ। স্বর্গধামে পদার্পণের সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন জাতির মনুষ্যগণ, বিভিন্ন ভাষাভাষি একই দেহে বিলীন হইয়া এক সার্ব্বজনীন প্রেমসত্বাতে পরিণত হইয়া আনন্দ উপভোগ করেন। পুণরায় ইচ্ছা করিলে নিজ ধর্ম, নিজ ভাষা, নিজ ধর্মের চাল-চলন সবই ফিরিয়া পান। স্বামী সত্যানন্দ বুঝিতে পারিয়াছেন স্বর্গে বহুত্ব ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া একত্রে রূপান্তরিত হয়—আবার একত্ব বহুত্ব প্রাপ্তি হইয়া নিজ ধর্মের, নিজ ধর্মের আচারের-বিচারের ব্যষ্টি চৈতন্যের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতে পারেন। স্বর্গধাম নানা জাতির, নানা আচার-বিচারের সমন্বয় সাধনের এক সার্ব্বজনীন ভূমি—কেবল আনন্দম্-আনন্দ. প্রেম্-প্রেম, শান্তি-শান্তি, শান্তি-করীম্, শান্তি-করীম্। অক্ষয় স্বর্গ, অক্ষয় প্রেম, অক্ষয় শান্তির ভূমি। মোট কথা ভৌগোলিক দূরত্ব, আবহাওয়ার ও আচার-বিচারের বিভিন্নতা থাকিলেও সমগ্র

মানবজাতির হৃদয় এক হইয়া একই পরমের দিকে ধাবিত হইতেছে। বহুত্বের চরম বিভিন্নতার নাম বিশৃঙ্খলা—একত্বের চরম একাকীভূতের নাম শৃঙ্খলা। তাই পৃথিবীতে আইন প্রচলন করিয়া শৃঙ্খলা আনিতে হয় আর স্বর্গে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শৃঙ্খলা আপনা-আপনি উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসর পর স্বামী সত্যানন্দ স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া নিরবিচ্ছিন্ন সুখস্বাচ্ছন্দ পবিত্রতার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। এতদিন পর তাঁর মনে একটি প্রশ্ন উদিত হইয়াছে—কেন যীশু, কেন কৃষ্ণ, পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন? কারণ একটাই, সর্বজীবের অন্তরে অবস্থান করিয়া পৃথিবীবাসীদের, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের স্বাদ, অভাব-অভিযোগের স্বাদ তাঁরা কেন বা গ্রহণ করিয়াছিলেন? পৃথিবী ঈশ্বরের লীলাভূমি—স্বর্গের ন্যায় একচেটিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ—প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা পৃথিবীতে নাই—আছে সুখ-দুঃখ মিশ্রিত, প্রাচুর্য্য ও অভাব মিশ্রিত, কামনা-বাসনা মিশ্রিত একটি সকল বস্তুর রসায়ণ। এখানেও মানুষ কামনা-বাসনা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামী হইয়া মহাপুরুষ বা মহাদেবীতে রূপান্তরিত হইতেছে। সল—পলে রূপান্তরিত হয়—চণ্ডা শোক ধর্মা শোকে রূপান্তরিত হয়। সিদ্ধার্থ গৌতমবুদ্ধে পরিবর্ত্তিত হন—অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া। জীবের উপকার করিয়া, জীবকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া রামকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব এই পৃথিবীতে হয় এবং এই পৃথিবীর মানুষ সাধনা বলে দেবত্বের গতি লাভ করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে মিশ্র স্বাদের আস্বাদন, মিশ্র স্বাদের রসায়ণ পান করিয়া মানুষ দেবত্বে পৌছিয়া যায়। তাই স্বামী সত্যানন্দ দু হাতে পৃথিবীর রথ

আকাশে-বাতাসে-মাটিতে পান করিয়া জগতের ও জগত বাসীর উপকার করিতে চান। অপূর্ব্ব সে অনুভূতি মৃত্তিকার ঘনিষ্ঠ পরশ, অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ জাগে ধরণীর বাতাসে—ফিরে যেতে চায় হিয়া সুদূর পৃথিবীতে—পাহাড়ে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে, সমুদ্রে, উলঙ্গ আকাশের নীচে—যেখানের মানুষের সুখ-দুঃখ ধ্বনিত হইতেছে আনন্দ ও নিরানন্দের কলরবে। পৃথিবী বাসীর সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, শান্তি-অশান্তি সাহেব সাধু ধমনিতে পুরিয়া লইতে চান। পৃথিবীতেও জীবনের শেষ দিন আসিবে—জীবনের হইবে অবসান—মাটিতেই মিশে যাবে তাঁর শরীর। পুণরায় জন্ম লইয়া তিনি মাটিতেই বাস করিবেন—আবার জাগিবে সাড়া—ঘুমাবে-জাগিবে, জাগিয়া-ঘুমাবে, ঘুম-জাগা বারে বারে।

স্বামিজীর ভীষণ প্রাণের তৃষা—তাঁর প্রাণেতে জেগেছে এক ভীষণ প্রাণের তৃষা—তিনি পৃথিবীতেই জন্ম লইতে চান। পৃথিবীতে পুণরজন্ম একি পাগলামি? না বাতুলতা—না এক ভীষণ ভুল! তবুও তিনি অটল—পৃথিবীতে জন্ম লইতে চান।

জীবনরূপ পুস্তকে দুটি পাতা রহিয়াছে—পৃথিবী না স্বর্গ? পৃথিবীর পাতাতে রহিয়াছে জ্বালা-যন্ত্রণা আর সুখ-দুঃখের রসায়ণ। স্বর্গের পাতাটি রয়েছে একবারে ফাঁকা—না আছে দুঃখ-দৈন্যের ছবি আঁকা। মাঝে মাঝে তিনি চিন্তা করেন কেনই বা স্বর্গের ডোর ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে জন্ম লইবেন? কিন্তু সকল চিন্তার মাঝে পৃথিবী কেনই বা তাঁকে বার বার টানিতেছে।

এবার তিনি বুঝিয়াছেন—এ চিন্তা তো তাঁর নিজস্ব নয়—ঈশ্বরের আদেশ। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবজাতিকে

আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করিয়া--হিংসা নিবৃত্তি করিতে ঈশ্বরই তাঁকে পৃথিবীতে জন্ম লইতে নির্দেশ দিতেছেন।

সবশেষে স্বামিজী—স্বর্গ অভিমানিনী দেবতাকে, ক্রমে ক্রমে তেজ অভিমানিনী দেবতাকে, চন্দ্র অভিমানিনী দেবতাকে স্মরণ করিয়া—ঈশ্বরের আদেশ স্মরণ করিয়া সুদূর আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করেন। সুদূর আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিলেও বার বার তিনি ভারতবর্ষের পুণ্যতীর্থগুলিতে, হিমালয়ের পুণ্যতীর্থযুক্ত পর্ব্বত-মালাগুলিতে, বক্রেশ্বর ধামে ছুটিয়া আসেন। উদার বিশ্বপ্রেমে ও জীবপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া এই স্বামী সত্যানন্দ পবিত্রতার ও আধ্যাত্মিকার বর্তিকা বহন করিয়া মানবজাতিকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। নানা লীলা প্রদর্শন করিলেও—কোন কর্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

সাহেব সাধুর গত জন্মের স্মৃতির পর্দায় রোমান্থনের ছেদ পড়িয়াছে—বহুক্ষণ ধরিয়া তিনি মনের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া গত জন্মের স্মৃতি রোমন্থন করিতেছিলেন—এই বক্রেশ্বর নদী প্রান্তে অনাচ্ছাদিত একটি মোটর গাড়ীতে অবস্থান করিয়া। এই গাড়ীটিই তাঁহার আশ্রয় বা আশ্রম বলা যাইতে পারে। তিনি এবার বর্ত্তমান নিজ সত্বায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া তিনি জাতিস্মরের ন্যায় পূর্ব্ব জন্মের ঘটনাগুলি স্মরণ এবং রোমন্থন করিতেছিলেন বক্রেশ্বরের ভক্তদের উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া। এই অবস্থায় অন্য মনস্কযুক্ত সাহেব সাধুকে দেখিয়া সকলে বিস্মিত বোধ করেন। মুখে অনুচ্চারিত হাঁসিটি লাগিয়াই আছে—তার সাথে

প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির সহযোগে এক মূর্ত্তিমান বিগ্রহের অবয়বটি দিব্যকান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। একদিকে বালক স্বভাব—অপরদিকে ভাব গম্ভীর। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু-চার‌জন ভক্তদের সাথে কথা বলিতে থাকেন।

বোলপুর থেকে আগত এক অধ্যাপক ভক্ত স্বামিজীকে হঠাৎ প্রশ্ন করেন—সাধনা কিভাবে শুরু করা যায়। প্রত্যুত্তরে সাহেব সাধু বলিতে থাকেন—প্রথম প্রথম মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া দোদুল্যমান মনকে বশে আনিয়া ইষ্টপদে বসাইতে হইবে। গুরুতে মনুষ্য জ্ঞান যেন না থাকে। ভক্তি ও বিশ্বাস সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি বলিতে থাকেন মহাজ্ঞানী কাক ভূষণ্ডি শ্রীরামচন্দ্রকে মানুষ ধারণা করায় ত্রিলোকের কোন জায়গায় স্থান পান নাই—কিন্তু পরে যখন রামচন্দ্রকে ভগবান বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন তিনি স্বর্গে স্থান পান। কাহাকে কোন পথ দিয়া ঈশ্বর লইয়া যাইবেন তাহা মনুষ্যের অগম্য।

কঠোর ত্যাগ তিতীক্ষা ও উদার বিশ্বপ্রেম লইয়া তিনি সন্ন্যাস জীবন-যাপন করিতে থাকেন। জ্ঞান বৈরাগ্য-নিষ্কাম কর্মানুযুক্তিসহ যেন এক মহাশক্তির উদ্বোধন। খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করিতে কদাচিৎ দেখা যায় না—শুধু সর্ব্বদাই সাধনার নেশায় বুঁদ হইয়া আছেন। কোন কোন রাত্রিতে—বিশেষ করিয়া অমাবস্যার রাত্রিতে দিন-একাসনে ঘন্টার পর ঘন্টা যজ্ঞ করিয়া যাইতেছেন—দিন-রাত্রির ও সময়ের ব্যবধান অগ্রাহ্য করিয়া। বক্রেশ্বরের পাণ্ডাকুলের কেহ কেহ সাহেব সাধুর নামে অজ্ঞান—নিজ কাজ ছাড়িয়া সাধুর নিকট বসিয়া থাকেন।

নারী মাত্রই তাঁহার নিকট দেবী বা "মা"—আপ্লুত কণ্ঠে নিজ মনে বলিতে থাকেন—"ব্রহ্মারূপা, লজ্জারূপা, মহেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন।" বীরভূমের সমস্ত পীঠ দর্শন এবং মহেশ্বরের সাধনা শেষ করিয়া কাশীধামে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া—হিমালয়ের পথে চলিতেছেন বদরীকাশ্রমকে লক্ষ্য করিয়া। বেন এইসব জায়গা তাঁর নিকট কত পুরানো, কত চেনা—গত জন্মের দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। কয়েকমাস কাটাইয়া সাহেব সাধু পুণরায় বক্রেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বক্রেশ্বরে যেন তাঁর জীবন কাঠিটা কোথাও লুকিয়ে আছে।

আজ শিবরাত্রি—বক্রেশ্বরে মেলা বসিয়াছে—লোকজনের ভীড়ে একেবারে জম-জমাট—কিন্তু সাহেব সাধুর লক্ষ্য নাই কোন দিকে। শ্যামলবাবু ও সুশীলকে লইয়া আধ্যাত্মিক আলোচনায় দিনরাত্রি স্বচ্ছন্দে কাটাইয়াছেন। নদীর তীরে বসিয়া কয়েকজন ভক্তকে তিনি শিবশক্তি সম্বন্ধে বলিতে থাকেন—"শিব ও শক্তি টাকার কয়েনের এপীঠ-ওপীঠ," স্বরূপতঃ কোন তফাৎ নাই। শক্তি ব্রহ্মস্বরূপিনী—তাঁর হইতে প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি সবই—তিনিই আনন্দময়ী, দেবী—তিনি শূন্য, অশূন্য, তিনিই স্থাবর, জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, সমুদ্র—আদ্যাশক্তির রূপ ব্যতীত "অপরং ন কিঞ্চিত"।

"ভূতারাং বক্রেশ্বরী দুর্গে—ভূবাননং বক্রেশ্বরী দুর্গে স্ত্রীয়োশ্চ-নরশ্চাপি দুর্গে, পশুশ্চ বক্রেশ্বরী দুর্গে, আকাশং-বাতাসং-পাতালং বক্রেশ্বরী দুর্গে, যদ্ যদ্ হি দৃশ্যং বক্রেশ্বরী দুর্গে। বক্রেশ্বরী দুর্গে স্বরূপাৎ—অপরং নঃ কিঞ্চিত।" ইনিই ব্রহ্মময়ী, দুর্গা, কালী,

জগদ্ধাত্রী॥ ব্রহ্মশক্তি, শক্তি, নির্গুনা ও সগুনা। শক্তি সর্ব্বগতা বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মময়ী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আদ্যাশক্তি দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ সচ্চিদানন্দ অপর ভাগ মায়া। মায়া ও মহামায়া, ভগবতী ঈশ্বরী একই জিনিষ। সূর্য্য ও সূর্য্যের কিরণ যেরূপ। এই আদ্যাশক্তির আনন্দময় সত্ত্বাকে আত্মা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই আত্মা—আত্মাই ব্রহ্ম। শক্তি স্বরূপতঃ স্ত্রী ও পুরুষ নয়—কিন্তু কেন শক্তি স্ত্রী লিঙ্গের পর্য্যায় পড়ে? তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী "তথাপি কল্প-বল্লীবৎ যুজ্যতে" অর্থাৎ কল্পলতা যেমন নারীবাচক নামেই প্রচলিত—সেইরূপ শক্তি শব্দই কীর্তিতা।" কল্পলতা বা কল্পবৃক্ষ (যাহার নিকট কামনা-বাসনা যাঞ্চা করিয়া ফল পাওয়া যায়) তাহাতে লতা বা বৃক্ষের শক্তির উপর বাড়তি এক দৈবশক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাই লতারূপিনী কল্পলতা অথবা বিশ্বস্বরূপা—জগতের মূর্ত্তির অতীত হইলেও তিনি স্ত্রীরূপে ধারিনী। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী দেবীকে নারীরূপ বা পুরুষরূপে অথবা সচ্চিদানন্দরূপে ধ্যান করা যায়—

ত্বং হি কৃষ্ণ
ত্বং হি কালী
ত্বং হি দুর্গে
ত্বং হি শ্রীহরি
সবই এক। —মাত্র-ব্রহ্মময়ী

শক্তিদের মতে সমস্ত দেব-দেবীগণ শক্তিরই রূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর শক্তির পুরুষ রূপ—দুর্গা-কালী-তারা ইত্যাদি ঐ একই শক্তির স্ত্রীরূপ।

মাতৃগর্ভকে উপনিষদে জন্মস্থল বা যোনী বলা হইয়া থাকে—সেই অর্থে দেখিলে ব্রহ্মময়ীকে বিশ্বযোনী বলা হয়। ভারতবর্ষে কামাখ্যা ধামকে যোনী পীঠ বলিয়া কথিত আছে।

ঋকবেদে রুদ্রকে পিতৃদেবতারূপ আর অদিতি-দিতি প্রভৃতিকে মহামায়া জগজ্জননীরূপে দেখা যায়। তন্ত্র মতে শিবশক্তির অবিভাজ্য সম্বন্ধ। শক্তি ছাড়া শিব নাই—শিব ছাড়া শক্তি নাই। অর্থাৎ লিঙ্গ ও যোনী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি মূলতঃ অভিন্ন।

ঋকবেদে যজ্ঞদেবীকে যোনী এবং তার উপরে প্রজ্বলিত অগ্নি রুদ্র বা শিব। এইজন্যই যজ্ঞদেবীকে গৌরী পট্ট বলা হয়। সমস্ত পুরুষই শিব ও সমস্ত নারীই উমা—শিবশক্তি মিলনের দ্বারা ও জীব-জগতের উৎপত্তি সমস্ত জগতে ব্যপ্ত। এই শক্তির বিভিন্ন নামে প্রচলিত হইলেও তত্ত্ব দৃষ্টিতে একই শক্তি, মায়া, মহামায়া, বিদ্যা, অবিদ্যা—ক্রিয়া ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখাইলেও জিনিষটি এক।

শৈবরা বলেন—বিমর্শ, বৈদিক পণ্ডিতরা বলেন—অবিদ্যা, তাছাড়া দেবী ভাগবতে কেহ বলেন—তপঃ, তমঃ, জড়, জ্ঞান, মায়া প্রভৃতি।

অবিদ্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন—অবিদ্যা অর্থে অজ্ঞানতা বুঝায়—যাহা বন্ধনস্বরূপ, বন্ধন আবার পঞ্চ রকমের—

১) জীবের মধ্যে ভেদজ্ঞান
২) ঈশ্বর ও আত্মার ভেদ
৩) আত্মার অনাত্ম বুদ্ধি
৪) অনাত্মার আত্মবুদ্ধি
৫) চৈতন্য ও আত্মার ভেদ।

অবিদ্যাবশতঃ মায়া ও মহামায়া ভেদ চিন্তা আমরা করে থাকি।

বক্রেশ্বর ধামে একদিকে কঠোর তপস্যা—ফাঁকে ফাঁকে ভক্তদের উপদেশ—ভক্তদের সুখ-দুঃখের সান্ত্বনা—এইভাবেই আনন্দের সাথে সাহেব সাধু পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন।

ভক্তদের অনুরোধেই সত্যানন্দ স্বামী নদীর তীর ত্যাগ করিয়া শ্বেত গঙ্গার তীরে এক পরিত্যাক্ত শিবমন্দিরে আসন স্থাপন করেন, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত স্থানীয় ভক্তদের ও পাণ্ডাকুলের আগমন। এই শ্বেত গঙ্গাকে স্থানীয় লোকেরা বৈতরণী কুণ্ড কহিয়া থাকেন। এই কুণ্ডে স্নানে পূণ্য ও রোগ নিরাময় হইয়া থাকেন। এইরূপ প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। নীচ হইতে উর্দ্ধে সতত গরম জল উত্থিত হইতেছে। উত্তরদিকে অক্ষয় বটবৃক্ষ—তাহার একটু দূরে নিগমানন্দের শিষ্য মেটে বাবার আশ্রম। তাছাড় পাশাপাশি আটটি শিবমন্দির ও খাঁকী বাবার শ্রীশ্রীকালী মন্দির রহিয়াছে। অষ্টচক্র মুণি ও বক্রেশ্বর শিবমন্দির পার্শ্বে রয়েছেন ৺মাতা মহিষী মর্দিনী—ছোট্ট একটি মন্দিরে ৺মাতার ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি। সকলের ধারনা এই স্থলেই ৺দুর্গামাতার "ভ্রূ" স্থানটি নিপতিত হইয়াছিলেন—তাই এটি মহাপীঠস্থান। সাধক খাঁকী বাবা উদ্যোগ লইয়া এই মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধক খাঁকী বাবা খাঁক অর্থাৎ ছাই মাখিয়া থাকিতেন বলিয়া তাহাকে স্থানীয় লোক খাঁকী বাবা বলিয়া সম্বোধন করতেন। অন্যদিকে এতগুলি উষ্ণ প্রস্রবণের একত্রে সমাবেশ ভূ-ভারতে দেখা যায় না। ভবিষ্যতে এই উষ্ণ প্রস্রবণের জল হইতে অনেক কিছু উদ্ভাবনার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না—বিশেষ করে চিকিৎসা জগতে

অনেক কিছু আবিষ্কারের পথ নির্দেশ করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন—বর্ত্তমান ব্যতীত ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্ত্তমানের চিন্তা যেমন নিরর্থক—সেইরূপ পরকালের ভাব ব্যতীত ইহাদের চিন্তা অসম্ভব।

সুতরাং বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ এবং ইহকাল ও পরকাল একই সূত্রে গথিত—গন্তব্যস্থল এক। পৌরাণিক আখ্যান এবং কাহিনীর অন্তরালে বিজ্ঞানের অনেক কিছু জিজ্ঞাসা লুকায়িত রহিয়াছে—ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তাহা উদঘাটিত হইবে।

স্বামী সত্যানন্দের নিকট আজ বার্ত্তা আসিয়াছে যে আজ অমাবস্যায় গভীর নিশীথে তাঁর পূর্ব্ব আবাস স্থলের সন্নিকটে ৺বক্রেশ্বরী শিলামূর্ত্তির নিকট শেওড়াবৃক্ষের নীচে চক্র বসিবে। কামাখ্যাধাম হইতে পাঁচজোড়া ভৈরব-ভৈরবী গতকাল রাত্রিতে পৌঁছিয়াছেন—তাই মহেশ বাবা স্বামী সত্যানন্দকে চক্রস্থলে আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

রাত্রি একটা—চারিদিকে শন্ শন্ আওয়াজ, অদূরে নিকটবর্ত্তি শ্মশানে কয়েকটি শব দাহন হইতেছে, মাঝে মাঝে শৃগাল কুকুরের দ্বন্দ্ব। ভৈরব-ভৈরবীর দল ও মহেশ বাবা ৺মাতা বক্রেশ্বরীর পাষাণ মূর্ত্তির সম্মুখে উপবিষ্ট ও উপবিষ্টা। এধার-ওধার কয়েকটি প্রদীপ গোবরের ঢেলার মধ্যে স্থাপন করিয়া জ্বালানো রহিয়াছে—চারিদিকে অসংখ্য ধূপকাঠির সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। জোড়া জোড়া ভৈরব-ভৈরবীর দল বক্রেশ্বরীর পাষাণ মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করিয়া

গোল করিয়া বসিয়া আছেন। শিলামূর্ত্তির সংলগ্ন ৯টি পিঁড়িতে নগ্ন মহেশ বাবার কোলে নগ্নাত্যারিনী ভৈরবী বসিয়া আছেন—মহেশ বাবাই চক্র পরিচালনা করিবেন। এইভাবেই প্রত্যেক নগ্ন ভৈরবের কোলে এক-একজন নগ্না ভৈরবী উপবিষ্টা। প্রায় দশ-হাত দূরে দুইটি পৃথক আসনে বসে আছেন স্বামী সত্যানন্দ ও সুপ্রভাতবাবু—তাঁরা দর্শক হিসাবে এই চক্রে আনন্দিত হইয়াছেন। সর্বপ্রথম মহেশ বাবা নগ্না ভৈরবীকে পিঁড়ির মধ্যে বসাইয়া পূজা শুরু করিয়া দিয়াছেন—প্রথমে পদদ্বয়, জঙ্ঘা, যোনী, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারে—তাঁহার অনুকরণে অন্যান্য ভৈরব নিজ নিজ ভৈরবীকে অনুরূপভাবে ফল, পুষ্প ও জল দিয়া পূজা শেষ করিলেন। ভৈরব-ভৈরবীদের দলের কাহারও দেহ ও মনে কামনার কোন ছাপ বা চিহ্ন নাই—তাঁহারা এখন অন্য জগতের মানব-মানবীর দল অন্য ধাতুর মানুষ।

পূজা শেষে ভোগ নিবেদন, পঞ্চমাকারে ভোগ প্রদান, কেবল মৈথুনের পরিবর্ত্তে শ্বেত অপরাজিতার পুষ্পের সহিত রক্তচন্দন লেপিত পুষ্প প্রদান। দর্শক স্বামী সত্যানন্দ ও সুপ্রভাতবাবু ব্যতীত সকলেই মড়ার মস্তকের খুলির পাত্রে আকণ্ঠ কারণ বারী গ্রহণ করিলেন।

সকল নগ্ন ভৈরব—নগ্না ভৈরবীদের কোলে স্থাপন করিয়া মাতৃ সাধনায় মগ্ন ও মগ্না। ইহা একপ্রকার বামাচার সাধন প্রক্রিয়া। নারী হইতে পুরুষের এবং পুরুষ হইতে নারীর দেহ-কামনার দরুন পুরুষ ও নারীর পতন ঘটিয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক জগতে পদস্খলন ও জীবনের বিশৃঙ্খলা আনিয়া দেয়

বলিয়া ঐ দেহ-কামনা স্বরূপ জলন্ত অগ্নিকে লইয়া খেলা করা ছাড়া কিছুই নহে। অগ্নির স্পর্শ দেহে লাগিবে, কিন্তু দেহ ও মন অগ্নিতে জড়িবে না। জলন্ত অগ্নি জয় করিয়া দেহ ও মনে আধ্যাত্মিক ভরে শীতল শান্তি বারির স্পর্শ লাভ করা এবং দেহ-কামনাকে জয় করা। দেহ-কামনা সাধনার প্রধান অন্তরায়—তাই চক্র অনুষ্ঠান দ্বারা দেহ-কামনাকে জয় করিয়া কামজিতে পরিবর্ত্তিত হওয়া।

যাক্—এবার নগ্ন ভৈরবের দল নগ্না ভৈরবীদের কোলে বসাইয়া মাতৃ-সাধনা শুরু করিয়াছেন—কেহ করিতেছেন জপ, কেহ করিতেছেন ধ্যান—লক্ষ্য কিন্তু এক মাতৃ-দর্শন মাতৃ-কৃপা লাভ।

কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ মহেশ বাবা ও তাঁর ভৈরবী সুষ্ঠভাবে চক্র পরিচালনা করিতেছেন। বেশ কিছুক্ষণ তালে তালে এক-একজোড়া ভৈরব-ভৈরবী প্রাণায়াম করিয়া যাইতেছেন। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত মধুর আস্বাদন ধীরে ধীরে করিতেছেন—দীর্ঘক্ষণ কুম্ভক করিয়া অনুচ্চারিত মাতৃনাম, জপ ও ধ্যান করতঃ রমনাস্তব্ধ করিয়া—মাংস সাধন করিতেছেন—মাংসের অর্থ বাক্য সংযম—নিস্তব্ধ ভাব।

ইড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী সুষুম্নার মধ্য দিয়া বায়ু সঞ্চালন মৎস্য প্রসাদ আস্বাদ করিতেছেন। শিরঃস্থিত সহস্র দল কমলে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে পারদতুল্য আত্মার অবস্থিত কুল-কুণ্ডলিনী সমন্বিত হর-পার্বতী মিলনের নাম মুদ্রা সাধনা প্রাণায়ামের সাহায্যে সহস্রা চক্রে যাইয়া সকলে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

কোন ভৈরব-ভৈরবীর নাই— অদূরে উপবিষ্ট সাধক সত্যানন্দ স্বামী কখন যে সমাধি মগ্ন হইয়া গিয়াছেন—তাহা চক্রের মধ্যে একমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি সুপ্রভাতবাবু বুঝিতে পারেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় চক্র স্থানটির দশ-পনের ফুট উচ্চে একটি ঘন নীল ও হলুদ মিশ্রিত জ্যোতির চাঁদোয়া দেখা যাইতেছে।

স্বামী সত্যানন্দের অবয়বটি গোটাগুটি জ্যোতিতে আকৃত— তাঁদের মুখখানিও দেখা যাইতেছে না। কিছুক্ষণ পর স্বামীজীর মুখখানি দেখা গেলেও তাঁর মুখের ভাব পালটাইয়া পাতলা জ্যোতির মধ্যে সুশান্ত দিব্যকান্তি যুক্ত একটি বালক মূর্ত্তিকে দেখা যাইতেছে।

হঠাৎ স্বামীজীর মস্তকের জ্যোতিঃ তীব্র আভাময় হইয়া সমস্ত অবয়বটি জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। সুপ্রভাত লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন স্বামীজীর মস্তকের উপরে নূতন তারাবলীসহ নূতন গগনে যেন চন্দ্রদেব ক্রমশঃ উত্থিত হইতেছেন—মূহুর্ত্ত মধ্যে তাহা পালটাইয়া—জ্যোতির মধ্য হইতে তিমির গর্ভে সূর্য্যকান্তি মণিসম প্রচণ্ড আভাময়ী হাস্য-মুখী এক দেবীর সচকিত আবির্ভাব ও সচকিত তিরোভাব সুপ্রভাতকে আকুল করিয়া তুলে।

দুই-তিন ঘণ্টা পর সকলের জ্ঞান হইলেও—স্বামী সত্যানন্দের তিনদিন কোন জ্ঞানই ছিলনা সেবার। চক্রভূমির চারিদিক স্তব্ধ— ব্যতিক্রম শুধু কয়েকশত পেঁচকের আনন্দধ্বনি। শিলা-বেদীর আশে-পাশের বাবলা গাছগুলির উপর এই পেঁচকের দল আশ্রয় লইয়াছে ও আনন্দ কলরবে মাতিয়া উঠিয়াছে— কোথায় গেল পেঁচকের সর্ব্বস্ব ধ্বনি? আশ-পাশের জন্তু-জানোয়ারদের দেহে

জ্যোতির স্পষ্ট লালিমাছে—একটানা শৃগাল কুকুরের একসাথে প্রবল আনন্দের ডাক চক্রভূমিকে কম্পিত করিতেছে।

নিকটস্থ একটি আশ্রমের আম্রবৃক্ষের মগডালে দুটি ছোট পাখী "জয় শিব—জয় তারা" এই রবে ডাকিয়াই চলিতেছে—তারই প্রত্যুত্তর আসছে অষ্টবক্র মুণির মন্দির সংলগ্ন কোন এক বটবৃক্ষের শাখা হইতে।

শ্মশানভূমিতে একসাথে চারটি শবদাহ হইতেছে—চিতার আলোতে শ্মশানভূমি ঝলমল ও আলোময়। তার সাথে মিশে গেছে ঐ চক্রভূমির জ্যোতির আস্তরণ।

আশপাশের বনস্থলী হইতে প্রভাত হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া কোকিল-কোকিলা, ফিঙ্গে-বুলবুলী পাখীর দল প্রভাতী সঙ্গীতে মাতিয়া উঠিয়াছে।

হরিদ্বার হইতে কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসী বক্রেশ্বর ধামে পৌঁছিয়া স্বামী সত্যানন্দের সাথে দেখা করিতে আসিয়াছেন। ভুতানন্দ ও সর্বানন্দ—দুই তরুণ সন্ন্যাসী স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়াই চলিতেছেন— স্বামীজী মুচকি হাসিয়া ধীরে ধীরে তার উত্তর দিতেছেন।

ভূতানন্দ—মানবের দেহের সাথে সাধনার কি সম্বন্ধ?

স্বামিজী—দেহ ব্যতীত পুরুষার্থ থাকিতে পারে না। বেঁচে না থাকলে শুভকর্ম ও শুভ দর্শন হইবে কি করে? উপনিষদে দেহকে দেবতাদের মন্দির ও জীবকে শিব বলা হইয়াছে। অবশ্য বিদেহী অবস্থায় সাধনা চলিতে পারে—তবে উচ্চ স্তরের যোগী ব্যতীত উহা সম্ভব নয়। সাধনা যাহা কিছু করিবে—পৃথিবীতে এই মানব দেহে করিয়া যাও—নতুবা আরব্ধ সাধনার জন্য এ পৃথিবীতে বার বার আসিতে হইবে।

সর্বানন্দ—মৃত্তিকা নির্মিত দেব-দেবীকে কেন মনুষ্যগণ নত মস্তকে প্রণাম করেন?

— একটি পুস্তক তোমার আলমারীতে সাজানো আছে—তাহা জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নহে—কিন্তু তুমি যখন বইটি পড়িতে থাকিবে—তখন পুস্তকটি জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া গুণাগুণ দেখাইতে থাকিবে। পুস্তক ও পুস্তকের ঘটনাবলী—পুস্তকের শিক্ষা জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

সেইরূপ যখন কেহ ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া ঐ মৃত্তিকা নির্মিত দেব-দেবীকে প্রণাম করে—তখন ঐ মৃন্ময় মূর্ত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠা হইয়া ঐ মৃত্তিকা মূর্ত্তি জাগ্রত হইবে—প্রাণ যাইবে। পুণঃ পুণঃ ভক্তি ও বিশ্বাস লইয়া যখন ভক্তগণ ঐ মৃত্তিকা নির্মিত মূর্ত্তিটিকে প্রণাম করিতে থাকে—তখন ক্ষণ ক্ষণ জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ঐ মূর্ত্তিটি জাগিয়া উঠে আমরা তখন মূর্ত্তিকে জাগ্রত দেব-দেবী বলিয়া থাকি।

ভূতানন্দ—মানব জনম দুর্লভ কেন?

স্বামীজী—বিশ্বসার তন্ত্রে মানব-জীবনকে শ্রেষ্ঠ জন্ম বলা হইয়াছে—কারণ মনুষ্য শরীরেই একমাত্র ষট-চক্রের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়—অন্য কোন দেহে নয়।

সর্বানন্দ—সাধকের প্রকার ভেদ আছে কি?

স্বামীজী—একদল নিষ্কাম সাধক—আরেক দল ভোগ সুখ-ধন পাইবার জন্য দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকে—বিপদ হইতে মুক্তির জন্যও কোন এক বিশেষ দেবতার পূজা অর্চনা করে।

সর্বানন্দ—তন্ত্রে কয়টি ভাগ?

স্বামীজী—পশ্বাচার, দিব্যাচার, বীরাচার।

পশ্বাচারের সম্পূর্ণ কামভাব ত্যাগ না হইলেও—সাধক, আলস্য, লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া পশ্বাভাবেও সিদ্ধিলাভ হইতে পারে—দীর্ঘকাল সময় লাগে। গৃহী তান্ত্রিক এই ভক্ত যোগী—শেষ জীবনে কামভাব ত্যাগ করিয়া বীরাচারে পৌঁছিতে পারেন এই গৃহীরা। দিব্যাচার তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। বীরচারে তান্ত্রিক সম্পূর্ণ কামভাব ত্যাগ করিয়া—পুরুষ প্রকৃতির দ্বন্দ্ব একেবারে মিটাইয়া ফেলে। ফলে যামাল ভাবের সৃষ্টি একটি সাম্যভাব আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়, একে দ্বৈতা-দ্বৈত মিশ্রিত ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে—পুরুষ প্রকৃতি এক হইয়া যায়। দিব্যভাবকে অদ্বৈত ভাব বলা যাইতে পারে—সাধক ব্রহ্মচর্যা পালন করিয়া দিব্যভাবের প্রভাবে ৺মাতার সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিতে থাকেন। সর্বরকম পাপ বা বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া মাতৃ নেশায় সর্বক্ষণ বুঁদ হইয়া থাকেন। দিব্যাচার প্রকাশ্য হইলেও বীরাচারের সাধনা একেবারেই গুহ্য বিষয়। দিব্য সাধকের সম্মুখে সমগ্র বিশ্বদেবতা-স্বরূপ—শত্রুমিত্র সমভাব অর্জন করিয়া ৺মাতা জগদম্বার চরণে নিজকে সমর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে থাকেন।

ভূতানন্দ—কামবীজ কি? যুগল সাধনা কাহাকে বলে?

স্বামীজী—যুগল সাধনায় কামবীজ ও কামগায়ত্রীর ন্যায় মধুরতম মন্ত্র জগতে দেখা যায় না এবং এই ভাব ও বীজ অবলম্বন করিয়া মানুষ দেবত্বের দ্বারে পৌঁছিয়া যায়। জ্ঞানী পুরুষদের শত্রু এই কামভাব। রমনী এই সংসারের কঠিনতম বন্ধন—যাহা মায়ার প্রবল শক্তি। কিন্তু কোন পুরুষ যদি এই রমণীকে আত্ম-শক্তিতে মিশাইয়া লইতে পারেন—তবে সেই পুরুষের ন্যায় শক্তিধর সাধক

জগতে দেখা যায় না। সকল আনন্দের যার এই কামমন্ত্র—সখীগণ গায়ত্রীস্বরূপ, রাধা বিষয়স্বরূপ, আর শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়-স্বরূপ। কবে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"দুই ধারা যখন একত্র থাকে তখন যুগল দেখে।"

চক্র সাধনায় এর বিষয় কিছুটা আন্দাজ করা যায়—যখন নগ্না ভৈরবী, নগ্না ভৈরবের কোলে বসিয়া যুগলে মাতৃ ধ্যানে বা মাতৃ জপে ব্রতী হন। এইভাবে পুরুষ-নারীর মোহিনী শক্তিকে নিজ আত্ম-শক্তিতে মিশাইয়া লইতে পারেন। সাধক-সাধিকার, ভৈরব-ভৈরবীর কামভাব নষ্ট হইয়া এক দিব্যভাবে অনুপ্রাণীত হন এবং পরমার স্বাদ গ্রহণ করেন।

ভূতানন্দ—গর্ভধারণ কে করে—পুরুষ না স্ত্রী?

স্বামীজী—পুরুষরাই গর্ভধারণ করে—উপনিষদের মতে। পুরুষের দেহের শুক্রই হচ্ছে গর্ভ—যাহা স্ত্রীর সহিত রমণকালে নারীর গর্ভে সঞ্চারিত হয়। নারী উহা গর্ভে ধারণ করিয়া নিজ অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া শুক্ররূপ গর্ভকে সন্তানরূপে প্রসব করিয়া প্রতিপালন করিতে থাকেন।

ভূতানন্দ—পঞ্চভূত দ্বারা মনুষ্য শরীর ও আত্মা গঠিত হয়?

স্বামীজী—দূর বোকা, তাহা কেন হইবে। পঞ্চভূত শরীরের উপাদান মাত্র। আসল জিনিস বৌম্। বৌমের আদি অন্তঃ নেই—এর অভ্যন্তরে প্রচণ্ড রহস্য লুকায়িত রহিয়াছে।

ভূতানন্দ—বৌম তো শূন্য। শূন্য মানে গুণহীন।

স্বামীজী—শূন্য হইতে শূন্য হয়—শূন্যের সহিত যে কোন সংখ্যার গুণ করিলেও শূন্য হয়। পুণরায় এই শূন্যই আধ্যাত্মিক স্তরে "ওঙ্কারে রূপান্তর মাত্র।"

তবেই বুঝ পৃথিবীর সবকিছু, প্রকৃতির সবকিছু গুণাগুণ—এই শূন্যে বা বৌমে রহিয়াছে।

এতদ্বারা সিদ্ধান্ত লইতে পারা যায় যে, শূন্যের শূন্যত্ব বা শূন্যের উর্দ্ধে বা অতীতে কোন দৈবী বস্তুর স্বীকার করিতে হইবে। শূন্যের গুণ স্বীকার করিলে শূন্যের শূন্যত্ব থাকে না—এই সমগ্র বিশ্ব শূন্যের দ্বারা হইতে পারে না। সুতরাং শূন্যের অতীত এক রহস্য-পূর্ণ শক্তি লুকায়িত রহিয়াছে- যাহার দ্বারা সবকিছু সম্ভব হইতে পারে।

ভূতচতুষ্টয় রহিত গুণ স্থানের নাম বৌম- তাহাই চৈতন্যরূপ জ্ঞানময় ঈশ্বর। যিনি ক্ষীতী, অপ, তেজ, মরুৎ, মৌমের উৎপাদক এবং ধারক ও বাহক। বৌমের অপর নাম "ওঙ্কার" বলা যাইতে পারে- তাই প্রতি মন্ত্রের প্রথমে ওঙ্কার জুড়িয়া দেওয়া হয়- অর্থাৎ মন্ত্রের সার্থকতা বৃদ্ধি পায়।

তাই বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও পুরোহিতকে বৌম বা ওম্ উচ্চারণ করিতে দেখা যায় পূজার সময়। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম প্রভাতের ইতিহাসের কথা স্মরণ করেন।

ভূতানন্দ—স্বামীজী পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী "দক্ষ" কথার অর্থ কি?

স্বামীজী—দক্ষ শব্দের অর্থ সংসারের মধ্যে ভোগে ও কামনায় নিপুণ। কিন্তু ঈশ্বর বিমুখ। তাই রাজা দক্ষ—শিবকে ত্যাগ করিয়া, শিবকে পছন্দ না করিয়া কোন এক মহারাজের সাথে সতীর বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে স্থির হইয়াছে সত্যানন্দ স্বামী সুপ্রভাত ও কানু বোষ্টমীর সাথে জয়দেবে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া অজয়-নদের ওপারে বিখ্যাত শ্যামারূপার মন্দির দর্শন করিতে যাইবেন।

কানু বোষ্টমী অল্প-বয়সেই মাতৃ-পিতৃহারা হইয়া বক্রেশ্বরের এক বৈষ্ণব আখড়ায় বসবাস করিতে থাকে। সুন্দরী এই বৈষ্ণবী সুমিষ্ট গলার অধিকারিণী—সকলের ভালোবাসা পাইয়া সারাদিন একতারা হাতে সকলকে গান শোনাইয়া—গানের নেশায় বুঁদ হইয়া থাকে সর্ব্বসময়। সুপ্রভাতের সাথে যেন তার মনের মেল রহিয়াছে—একই গ্রামের একই পাড়ার বাসিন্দে উভয়ে। বয়সে কিছু ছোট হলেও কানু সুপ্রভাতকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়া দেখা হইলেই দু-এক কলি গান শুনাইয়া পথ ছাড়ে। এক নিষ্কাম ভালোবাসা বাঁসা করিয়াছে তাঁহাদের হৃদয়ে।

কানুর গুরুদেব বুড়ো বাবাজী জয়দেবে কদমখণ্ডী ঘাটের নিকটে আখড়া করিয়া বসবাস করিতেছেন। তাই কানু স্বামীজী ও সুপ্রভাতের সাথে জয়দেব যাইবার মনস্থ করিয়াছে। উভয়েই স্বামীজীর সান্নিধ্যে পাইবার জন্য উদগ্রীব—উভয়েই দিনের অধিকাংশ সময় স্বামীজীর পাশে থাকিতে ভালোবাসে। তাই স্বামীজী মাঘ মাসের প্রথম দিকেই উভয়কে লইয়া জয়দেব যাইবার মনস্থ করিয়াছে।

রাত্রি একটা—একটি গো-গাড়ী তিনজন যাত্রীকে লইয়া জয়দেব যাইতেছে। দুবরাজপুর রোড ত্যাগ করিয়া হেতমপুরের জঙ্গলের মধ্যে গাড়ী চলিতেছে—যাত্রীরা সকলেই অর্দ্ধ-নিদ্রিত—জাগ্রত কেবল গাড়ীর দারোয়ান।

ভোর হইবার একটু আগে গাড়ীটি কাঙ্গালী ক্ষাপার আশ্রমের নিকট কদমখণ্ডী ঘাটের পাশে বুড়ো বাবাজীর আখড়ায় পৌঁছিয়া যায়।

বুড়ো বাবাজী স্বামীজীর আগমণ বার্ত্তা পাইয়া আখড়া হইতে বাহির হইয়া সকলকে আপ্যায়ণ করিয়া আখড়াতে লইয়া যায়।

মেলা শেষ হইলেও তাহার জের এখনও শেষ হয় নাই—মেলা প্রাঙ্গণে বহু আউল-বাউল, সাধারণ লোক রহিয়া গিয়াছে। চারিদিকে প্রভাতী হরিণামের প্লাবন, হরিণাম উচ্চারণ করিয়া করতাল বাজাইয়া বহু ব্যক্তি জয়দেব পরিক্রমায় ব্যস্ত—কি এক অপরূপ দৃশ্য।

স্বামী সত্যানন্দ অনুধাবন করিতেছেন—হরিণামে এতই মধুরতা, এতো বিশালতা, এতো প্রসারতা। সর্বকালের, সর্বগানের, সর্বতানের, সর্বসুরের সংখিত এই হরিণাম। কেহ এই নামের গুণ পরিমাপ করিতে পারে না। মেলা শেষে যাত্রী সব ফিরিছে নিজ আলয়ে—অজয় নদের কিনারা ঘেঁসিয়া কাশবনের মধ্য দিয়া স্কন্ধে ঝোলা, হাতে কম্বল।

ওদিকে দেখা যায় কদমখণ্ডি ঘাটের শ্মশানে পাশা-পাশি দুইটি চিতা জ্বলিতেছে—আকাশে-বাতাসে, জীবনের নশ্বরতা ও কালের গতি স্বয়ং মহামায়া ঘোষণা করিতেছেন।

"মানুষ ! মানুষ ! কত যে তুচ্ছ
ধন-দৌলত পেয়েই—বেরোয় পুচ্ছ।
কদমখণ্ডী ঘাটে আছে তার রহস্য।"

স্বামীজী চুপ করিয়া সব নিরীক্ষণ করিছেন। স্বামীজী আশ-পাশ ঘুরিয়া বড় বাবাজীকে সাথে লইয়া কদমখণ্ডী শ্মশানে আসন পাতিয়াছেন—বড় বাবাজীর আখড়া হইতে মাত্র একশ হাত দূরে।

আজকাল বুড়ো বাবাজী দিনের অধিকাংশ সময় স্বামীজীর সাথে অতিবাহিত করেন—রাত অবধি চলে সেই একই আধ্যাত্মিক আলোচনা। সুপ্রভাতও প্রায় সব সময় স্বামীজীর নিকটে নিকটে অবস্থান করে—তাঁকে ছেড়ে কোথাও যায় না। কাহু সারাদিনের পর সেই সন্ধ্যা হইতে আসিয়া বহু রাত্রি অবধি স্বামীজী ও বুড়ো বাবাজীর সহিত থাকিয়া আখড়ায় ফিরিয়া যায়। আবার প্রত্যুষা হইতে ভীক্ষায় বাহির হইয়া দুপুরে ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া স্নানাদি সারিয়া ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করিয়া নিজে গ্রহণ করে।

সুপ্রভাত বুঝিয়া উঠিতে পারে না—স্বামীজীর ন্যায় একজন শাক্ত সন্ন্যাসীর সাথে বুড়ো বাবাজীর মত বৈষ্ণবের কি করিয়া এতো পরস্পর শ্রদ্ধা জন্মাইতে পারে।

স্বামীজী সুপ্রভাতের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাকে বলতে থাকেন— "ত্বং হি কৃষ্ণ

ত্বং হি কালী

ত্বং হি দুর্গা

ত্বং হি শ্রীহরি।"

সবই এক! মহামায়ার মায়ার দ্বারা আমরা ভেদ দেখি—সবই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বহু রূপ ধারণ করিয়াছেন।

এক-একদিন বুড়ো বাবাজী কাহুকে গান করিতে বলিলে—কাহু গাহিতে থাকে—

"জীবন গাড়ী চলছে ছুটে ছুটে
সুখ-দুঃখের তুফান তুলে
গাড়ীর ভেতর বন্দী মোরা
উঠছি দুলে দুলে।
ছুটছে গাড়ী দু-পাসাড়ী
সুখ-দুঃখ পিছন ফেলে
কালো ডোরা রেল চাকাটি আপনি
ঘুরে অবহেলে।
দু-পাসাড়ী—গাছের সারি
তুলছে মাথা কুতুহলে।
যাত্রী চাপে—যাত্রী নামে
সুন্দর মাঠে নামছে সকাল
সকাল গড়িয়ে হচ্ছে বিকাল
অবশেষে রাত্রি আসে
জীবন গাড়ী ছুটে চলে।
কেহ নাচ—কেহ হাঁসি
ট্রেনের মধ্যে বন্দী আমরা
হাঁসি-কান্নার যাত্রীতে ভরা
এই ট্রেনের কামরা।"

সকলে নিস্তব্ধে এই গান শ্রবণ করিতেছেন। গান শুনিয়া টল টল অঙ্গে, ভাবেতে বিহ্বল, মুখেতে মাতৃনাম। কদমখণ্ডী ঘাটে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন স্বামীজী। এদিন স্বামীজীর সমাধি হইয়া যায় সাথে সাথে। স্বামীজীর কখন যে সমাধি হইয়া গিয়াছে—কেহ খেয়াল করে না।

চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে—স্বামীজীর সমাধি ভাঙ্গে না। বুড়ো বাবাজীর শিষ্যেরা স্বামীজীর দাঁতের ফাঁক দিয়ে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সুপ্রভাত গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে—তাহার করিবার কিছুই নাই।

দাদু বোষ্টমী প্রতিদিন আশ-পাশের গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। সুন্দরী তরুণী বোষ্টমীকে দেখিয়া গ্রাম বধুরা আসে দ্বারে—ডেকে নিয়ে যায় রূপসী সুকণ্ঠি বৈষ্ণবীরে—আপন আপন ঘরে।

একতারা হাতে বৈষ্ণবী কাদু ঘুরিছে সারাটি গ্রাম—
চুড়া বাঁধ খোলা শ্রীমালা জড়ানো
ফিকা গৈরিক শাড়ীটি ছোপানো।

দুটি ঠোঁট যেন দুটি চন্দনা পাখী
গাহিছে কৃষ্ণ নাম—অবিরাম

কৃষ্ণ দু-আখি ঢালিছে অমিয়া
শ্যামল তনুর মধু-নির্য্যাস
গ্রামবাসীগণ পান করিতে থাকে।

কেন এতো ভালোবাসা? কারণ ঐ
শ্যাম অঙ্গে রয়েছে পল্লীর শোভা—
ওষ্টে রয়েছে গ্রামের হাঁসি

দেহ পল্লবে ফুলের সুবাস
পেয়েছে সে কৃষ্ণ বিলাস।

এইভাবেই বেশ কাটিতেছিল—কাদুর জীবন। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে এই দুঃখের পৃথিবীতে আর রাখিতে চান না। আজ বুড়ো বাবাজীর

আশ্রমে মহা বিপদ—মধ্যরাত্রি হইতে কাদুর ভেদ বমি হইতেছে। বিশুচিকা রোগে আক্রান্তা—ডাক্তার বদ্যি ওষুধ দিয়া গেলেও রোগের উপশম নাই। শিয়রে অতন্দ্রী প্রহরার ন্যায় সুপ্রভাত বসিয়া আছে—এক মুহুর্ত্তের জন্যেও তাকে কাদু ছাড়িতে চাহে না। শেষ রাত্রিতে কাদুর ধাত পড়িয়া গেলো--তাড়াতাড়ি বুড়ো বাবাজী ঘুরিয়া গ্রামের অমর কবিরাজকে লোক দিয়া আনয়ণ করিয়াছেন। কবিরাজ মশায় কাদুর নিদান হাঁকিয়া শেষ মকরধ্বজ চাঁটাইয়া ফিরিয়া যান। প্রদীপ নিবিবার আগে যেমন জ্বলিয়া উঠে তদ্রুপ কাদুর একটু জ্ঞান ফিরিয়াছে। সুপ্রভাতকে শিয়রে দেখিয়া সে বলিতে থাকে—"ওগো কালাচাঁদ! স্থান দাও দাসীরে তব চরণতলে।"

কাদুর মস্তক হেলিয়া পড়িল—হতভম্ভের ন্যায় সুপ্রভাত অশ্রুপাত করিতে থাকে—নীরবে শোকার্ত্ত হইয়া। কতো যে প্রেম ভালোবাসা দাদুর জন্য হৃদয়ে সঞ্চিত ছিল—তাহা সে ইতিপূর্বে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। নিজে নিজেই স্বগোক্তি করিয়া বলিয়া উঠে— "কেন আঁখি বৃথা বরষিছ?
কে মুছাবে জল? সে যে চলে গেল।"

ওদিকে আর্ত্তস্বরে ঘণ ঘণ কৃষ্ণ নাম হাঁকিয়া বুড়ো বাবাজী গোটা আখড়াটিকে সোরগোল করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি বলিতে থাকেন— "এসেছো দয়াল—এসেছো দয়াল—
কাদুকে মুক্তি দিতে।"

সুভাতের প্রেমের লতাটি চিরদিনের জন্য ছিঁড়িয়া গেল—কে জুড়াবে এই তীব্র শোক?

বুড়ো বাবাজীর আশ্রমের চরম বিপদ—একদিকে কাদুর মৃত্যু, আর একদিকে সমাধি মগ্ন স্বামীজী। বুড়ো বাবাজী ত্রস্ত পদে

একবার আশ্রম—আর একবার কদমখণ্ডী ঘাটে স্বামীজীর সমাধি অবস্থা অবলোকন করিতে থাকেন। তিনি বুঝিতেছেন—মনুষ্য-কালের দাস, কালই সংসারের কর্ত্তা, কালই সংসারের কর্ম ও ধর্ম, কাল বেশেই সংসারে কৃষ্ণের অবতরণ ও নির্গমণ।

বুড়ো বাবাজী কাতুর মৃতদেহটি দেখিয়া ভাবিতে থাকেন—কাতুর হাতের একতারাটি হইল নীরব—তাহা কভু আর হবে না সরব। চন্দনা পাখী থামাইয়াছে সুর—চরণ কমলে আর বাজিবে না নূপুর।

অশান্ত হৃদয়ে সুপ্রভাত কয়েকজন আখড়াবাসীকে সঙ্গে লইয়া অজয়ের তীরে কাশবনের মধ্যে কাতুকে মাটি দিয়া শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—ভালোবাসা ও প্রেমের থলেটা যেন কাশবনে হারিয়ে গেছে।

কাতুর সমাধি দেওয়ার পর সুপ্রভাতের মনে এক প্রবল ভাবান্তর আসিয়াছে—সে চিন্তা করিতে থাকে—বক্রেশ্বরে কাতুর হাতে গড়া আখড়াটি পেছনেই রহিয়া গেল—তার হাতের রোওয়া আমলকী গাছটি আজও ফল ভারে নুঁয়ে আছে—নতুন বকুল এসেছে কলমী আমের গাছে। কাতুর পোষা হরিবোলা পাখী—যাহা ছিল দিন-রাত্রের সাথী—খুজিবে তাহারে কথা বলিবারে। আখড়ার দেওয়ালে ঝুলিছে কৃষ্ণপট—তারই টাঙ্গানো, পায়ে সিঁদুরের দাগ—কে শোনাবে তাঁকে কৃষ্ণনাম?

কেন তুমি গেলে কবরভূমিতে? মাটির শয্যা নিতে? লাগবে কি ভালো—সেখানে কি আছে আলো? এদেশ ছেড়ে সে দেশ কি লাগবে ভালো? সে দেশের কি আকাশ নীল?
জরা-মরা-দুঃখ নাহি একতিল?

সেথা থাকবে কি করে—কার ভাবনা—
কিভাবে খবর পাবো—ঠিকানা সে যে জানে না—

কবরভূমি হইতে ফিরিয়া সুপ্রভাত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমাধি মগ্ন স্বামীজীর চরণ প্রান্তে নিদ্রাগত হইয়া যায়—একমাত্র আশ্রয়-স্থল বর্ত্তমানে।

আজ মৌনী অমাবস্যা! স্বামী সত্যানন্দজী অতি প্রত্যুষে সুপ্রভাতকে লইয়া জয়দেবের মায়া ত্যাগ করিয়া শ্যামারুপার মন্দির পানে যাত্রা করিলেন। উভয়ে অজয় নদ পার হইয়া শিবপুরকে ডানে রাখিয়া গড় জঙ্গলে প্রবেশ করে যাত্রা করিয়াছেন। রাস্তার মাঝে মাঝে শাল জঙ্গলের মাঠ, কেবল শিয়াল-কাঁটা আর লাগ-দেবীর ঝোঁপ। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখা যায়, কয়েকজন মেয়ে পাতা কুড়াইয়া জালের মধ্যে টিপে টিপে পুরিতেছে—কেহ কেহ মহুয়ার ফুল কুড়াইতেছে। একজন সাঁওতাল রমণী তাঁহাদের হাত ইশারা করিয়া বলিতেছেন—"বাবুরা উদিকে যাস না, চিতা বেরিয়েছে, দুটো গরু মেরেছে।"

স্বামীজী ও সুপ্রভাতের মনে ও দেহে ভয়ের কোন চিহ্নই নাই। ঘণ্টা দুই-একের হাঁটার পর এক সাঁওতাল পল্লীতে উভয়ে হাজির হইলে—সাঁওতাল রমণীগণ তাঁহাদের জল ও ঠোঙায় করিয়া প্রচুর পেয়াল ফল খাইতে দেয়—স্বামীজীর চক্ষে এক অনির্বচনীয় হাঁসি—তিনি সাদরে খাবার গ্রহণ করিলেন। কিছু চিড়া, মুড়ি, গুড় অতিথীদের ঝোলায় দেওয়া হইল।

সূর্য্যের তেজ ক্রমশঃ বাড়ছে, জঙ্গলের গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যরশ্মী কখনও কখনও উঁকি মারে—উভয়ে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিতে থাকেন।

অবশেষে জঙ্গের মধ্যে একটি পুকুরের পাশে ক্লান্ত দেহে—পুকুরের জল পান করিয়া নিবিড় গাছের ছাওয়াই উভয়ে বিশ্রাম লইতে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ পর বসিয়া দেখে অদূরে এক চিতা তাদের দিকে মুখ নাড়িয়া গর্জন করিয়া দুটি শাবককে ঝোঁপের মধ্যে রাখিয়া গেল—যেন তাঁদের শাবক দুটিকে দেখিতে অনুরোধ করিয়া সে শিকারে বাহির হইতেছে।

স্বামীজী হাত নাড়িয়া চিতাটিকে কি এক অজানা ভাষায় আশ্বাস প্রদান করিলে চিতাটি তাঁহার সামনে আসিয়া আরেকবার হুংকার ছাড়িয়া যেন স্বামীজীকে অভিবাদন জানায়। সুপ্রভাত ভীত সন্ত্রস্ত চিতাটির উপস্থিতিতে—এতো নিকটে সে জীবনে ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হয় নাই। স্বামীজী চিতাটির পিঠে স্পর্শ করিলে চিতাটি পোষা কুকুরের ন্যায় স্বামীজীর পদতলে দুইবার ডিগবাজী খাইয়া শিকারে চলিয়া গেল। সুপ্রভাত ভয়ে চক্ষু-মুদ্রিত করিলে কিরকম অসাড় বোধ করিতেছে, ক্রমে ক্রমে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্নে বিভোর সুপ্রভাত।

কাদু বোষ্টমী যেন তাহাকে বলিতেছেন—"ঠাকুর! তুমি আমাকে বুঝলে না—আমি যে তোমাকে ভালোবাসতাম আর স্বামীজীকেও আমার আর গুরু বলিয়া মনে করিতাম্—যদিও বুড়ো বাবাজী তো আমার প্রথম গুরু।"

বৈষ্ণব চূড়ামণি বুড়ো বাবাজী আর শক্তি চূড়ামণি স্বামীজীর পরস্পরের মধ্যে তো কোন তফাৎ চোখে পড়লো না—দুয়ে মিলে এক—প্রেম্-প্রেম্, ধর্ম-ধর্ম বিভিন্ন চাল-চলনে হলেও আসলে এক। মানুষের বুঝবার ভুল—এ একপ্রকার তাহা মহামায়ার মায়া।

মায়াই মানুষকে বুঝতে দেয় না—ভেদ দেখাইয়া দেয়। সুপ্রভাত স্বপ্ন হইতে উঠিয়া যেন চারিদিকে কাদুর সন্ধান করিতে থাকে। এইতো কাদু এখনই ছিলো, তার মাথায় হাত বুলাইতেছিল—কোথায় গেল সে? এখনও যেন কাদু তাহার সমস্ত মন অধিকার করিয়াছে, সে কাদুর কায়াহীন দেহান্তের প্রেমে মত্ত হইয়াছে—একজন দেহী অপরজন বিদেহী। স্বামীজী সুপ্রভাতের ঐ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া আপন মনে মুচকি হাসিতেছেন। সুপ্রভাতও স্বামীজীর ভাব দেখিয়া সলজ্জভাবে প্রণাম করিয়া বলিতে থাকে—এ আবার কি বিড়ম্বনা।

স্বামীজী বলিতে থাকেন—ও এক ঈশ্বরীর প্রেম। এক ব্যষ্টি-চৈতন্য আর এক ব্যষ্টি-চৈতন্যের সাথে মিলিতে চায়, পার্থিব প্রেম দেহান্তের পর কাদুর ন্যায় সৎ আত্মার নিকট অপার্থিব প্রেমে পরিণত হইয়াছে। এজন্মে না হোক্, আর এক জন্মে যে তোমাকে পাইবে। সুপ্রভাতের চক্ষু দিয়া নিরন্তর প্রেমের অশ্রু নির্গত হইতেছে—পৃষ্ঠে স্বামীজীর অঙ্গুলী স্পর্শ তাহাকে আরও ব্যকুল করিয়া তুলে। গাছতলায় বসিয়া সুপ্রভাতের চোখ জোড়া যেন আকাশে-বাতাসে কাদুকে পাগলের ন্যায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ পরে একটা খোরগোসের মৃতদেহ মুখে লইয়া চিতা বাবাজীর পুণঃ আগমণ। চিতাটি ঝোঁপের মধ্যে শাবকদ্বয়ের নিকটে ফিরিয়া একটি প্রবল হুংকার দিয়া জানাইয়া দিতেছে সে ফিরিয়াছে।

সূর্যদেব পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন—উভয়ে শ্যামারূপার মন্দিরে যাত্রা করিয়া দেখেন জঙ্গলের মধ্যে একটি বন বিভাগের অফিস, পাশে একটি বড় পুকুর, সাঁওতাল রমণীগণ স্নানান্তে

মাটির কলস ভর্তি করিয়া জল লইয়া ফিরিতেছেন। শ্যামারূপার মন্দির এখান থেকে বেশী দূর নহে—তবুও উভয়ে জোর পায়ে হাঁটিতেছেন।

যখন তাঁরা শ্যামারূপার মন্দির চত্বরে পেঁৗছিল, তখন মন্দিরের পুরোহিত সবেমাত্র আরতী শেষ করিয়াছেন। বারান্দায় লাঠি ও হ্যারিকেন হাতে একজন দারোয়ান অপেক্ষামান পুরোহিতকে রাস্তা দেখাইয়া বাড়ী লইয়া যাইবে। পুরোহিত মশায় সাহেব সাধুকে দেখিয়া বিনয়ের সহিত প্রচুর খাদ্য-দ্রব্যের ও ফল-মূলের ব্যবস্থা করিয়া—জরাজীর্ণ যাত্রী নিবাসের দিকে হাত বাড়াইয়া ওখানে রাত্রি যাপন করিবার অনুরোধ করিয়া মন্দির হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

দোতালার সমান উচ্চ এক প্রশস্ত টিলার উপরে শ্যামারূপার মন্দির নীচ হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি অনেক। মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে যেদিকে চোখ যায়—সেইদিকে ঘণ জঙ্গল দেখা যায়। বীর পুরুষ ইছায় ঘোষের তৈরী এই মন্দির, মন্দিরের পারিপার্শ্বিক বনশোভা মন্দিরটিকে আরও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

সামান্য ফলমূল গ্রহণ করিয়া সত্যানন্দ স্বামীজী মূল মন্দিরের সম্মুখে আসন পাতিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন—তাঁর চক্ষে নিদ্রা নাই। আর নড়বড়ে দরজাটি জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে কোন রকমে লাগাইয়া সুপ্রভাত একখানি কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়ে। মাঝে মাঝে খেয়াল হয় "তাইতো স্বামীজী একলা বাইরেই রহিয়া গেলেন।"

মুহুর্ত্ত মধ্যে নিদ্রাদেবী সুপ্রভাতের পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত দেহটিকে স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাহুর নৈসর্গিক উদ্যানে পৌঁছিয়া দেয়।

রাত্রির অন্ধকারের ঘনঘটা—জঙ্গলের মধ্যে জোনাকীর সারি, রাত্রির নির্জনতার সন্ সন্ শব্দ। বারে বারে এই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দেয় এধার-ওধার থেকে আসা জন্তু-জানোয়ারের বিভীষিকাময় চীৎকার। তাই সুপ্রভাতের নিকট ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইয়াছে—ভয়ে আতঙ্কে সে ঘুমায়ে পড়িয়াছে কাহুর স্মৃতিকে রোমন্থন করিয়া।

কিন্তু স্বামীজীর নিকট এই স্থান অতি উত্তম সাধনাস্থল প্রতীয়মান হইয়াছে। তাই তিনি ঝোলা হইতে যজ্ঞের তৈজস-পত্রাদি বাহির করিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তার উপর আজ অমাবস্যা তিথি—স্থান-কাল-পাত্র সবই অনুকূল স্বামীজীর নিকট।

যজ্ঞ যথারীতি চলিতে থাকে—যজ্ঞের গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। জঙ্গলের পশুগণ—শেয়াল, হায়না, এমন কি কুকুরের দল উত্তেজিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে স্বামীজীকে ঘিরিয়া যজ্ঞস্থল ও স্বামীজীকে ঘিরিয়া যেন আনন্দে চীৎকার করিতে থাকে—কেহ কাহাকেও হিংসা করিতেছে না।

একসাথে পশুগণের প্রচণ্ড আনন্দ—চীৎকারে সুপ্রভাতের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে, ভাঙ্গা জানালার মধ্য দিয়া সে দেখিতে পায় সব পশুগণ হিংসা পরিত্যাগ করিয়া একসাথে গলা ফাটাইয়া সোল্লাসে চীৎকার করিতেছে—যেন আনন্দের হাট পড়িয়া গিয়াছে। যজ্ঞ শেষে স্বামীজীর হস্ত হইতে সকল পশুগণ—

সানন্দ চিত্তে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে মুখ দিয়া। এই দৃশ্যে সুপ্রভাত মনে মনে চিন্তা করে—স্বামীজী মনুষ্য নহেন—দেবতা বা ঋষি।

ভাঙ্গা যাত্রী নিবাসটি চামচিকেতে ভর্ত্তি—তার উপর মশকের দংশন। সুপ্রভাতকে অতীষ্ঠ করিয়া তুলে—কিন্তু জন্তুদের ভয়ে বাহিরে আসিতে পারে না। কিয়ৎক্ষণ পর সুপ্রভাতের শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহটি ফের নিদ্রাগত হইয়া যায়।

প্রত্যুষে যখন সুপ্রভাতের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে দেখিতে থাকে—বেলা অনেক হইয়াছে, পুরোহিত মশায় পূজা করিতে মন্দিরে আসিয়াছেন—কিছু কিছু ভক্তজনেরও আগমণ হইয়াছে।

মন্দিরের একজন সেবক সুপ্রভাতের হাতে একখানি চিঠি দিয়া গেলো, তাহার সারাংশ হচ্ছে—"স্বামীজী প্রাতে হিমালয়ের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁকে সুপ্রভাত যেন খোজাখুজি না করে।"

সুপ্রভাত এই চিঠি পড়িয়া যেন আকাশ হইতে নিপতিত হইয়াছে—স্বামীজীর সংসর্গ হইতে আজ সে বিচ্যুত হইয়াছে। ওদিকে কানুও তাকে ইতিমধ্যে ত্যাগ করিয়াছে, তার জীবনে আর কি অবশিষ্ট রহিল?

কি করিয়া সে বক্রেশ্বরবাসীকে স্বামীজীর অন্তর্ধ্যান রহস্য জানাইবেন? কি করিয়াই বা বক্রেশ্বরের আখড়াবাসীকে কানুর মৃত্যু সংবাদ অবহিত করিবেন?

তার হৃদয় আজ শূন্য—বড়ই দুর্দিন তার জীবনে? বজ্রাহতের

ন্যায় একবার স্বামীজীর কথা, একবার কানুর মৃত্যুর ঘটনা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে সে যেন দেখিতে পাইতেছে, পদ্ম-পলাস লোচন জ্যোতির্ময় দেহে মুচকি হাঁসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে—"ডরো মাৎ—আগে বড়।"

ময়ুরাক্ষী ট্রেন লেট হওয়াই সুপ্রভাতের দুবরাজপুর ষ্টেশনে পৌঁছিতে রাত্রি এগারটা হইয়া গেল। যানবাহন নাই—তাই তাকে পদব্রজেই বক্রেশ্বর যাইতে হইবে। অবশ্য আজ পুর্ণিমা রাত্রি, হাঁটিবার অসুবিধা নাই। তার সহযাত্রী কেহই নাই, শুধু দেখা যাইতেছে—তার আগে আগে যেন একটি মেয়েছেলে ঘোমটা দিয়া রাস্তা চলিতেছে। কয়েকবার ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া গেল না—বুঝিল মেয়েটি লজ্জায় সাড়া দিচ্ছে না।

পূর্ণিমা রাত্রি—চারদিক জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। মাটির ঘাঁসের মাথাটিও চোখে পড়ে। কেহ কোথাও নাই—চলছে শুধু দুটি প্রাণী, একটু তফাৎ হইয়া।

মাঝে মাঝে দু-একটা শৃগাল-কুকুর একপদে রাস্তা অতিক্রম করিয়া মাঠে নামিয়া যায়—পেচকের দল রাস্তার পাশের গাছের উপর বসিয়া কর্কশ চীৎকার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে এক গাছ হইতে অন্য গাছে। কোন দূর গ্রামে কীর্ত্তন গান হইতেছে—তাহার সুর, কর্ণে প্রবেশ হইতেছে ঢেউ-এর আকারে। বহু দূরে বক্রেশ্বর ধামের দু-একটি বিজলীর আলোর রেখা মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে।

বক্রেশ্বর প্রান্তে পৌঁছিতে সুপ্রভাতের রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। ঝাঁপরতলা গ্রামের মধ্য দিয়া সহজ রাস্তা ধরিয়া

সে হাঁটিতেছে। নারী যাত্রীটিও একই পথে একটু তফাতে হাঁটিতেছে দেখিয়া সুপ্রভাতের কেমন যেন সন্দেহ হয়। গ্রামবাসীগণ নিদ্রা যায় সবে—কেহ কোথাও নাই, সবাই ঘুমায় ঘরে ঘরে—এই রাত্রিতে, শুধু চলেছে দুটি প্রাণী। অকস্মাৎ দেখা যায়—টল্ টল্ জল ভরা চোখে, সজল আঁখিপাতে দাঁড়িয়ে পড়েছে কাদুর অতিবাহিক দেহান্তের পরের দেহখানি।

জ্যোৎস্না প্লাবিত নিশীথে গ্রামখানি

অপরূপ অনুপমা—

তার সাথে মিশে গেছে কাদু প্রিয়তমা।

সুপ্রভাত দেখিতেছে তার বৈষ্ণবী প্রিয়া মরে নাই, মরে নাই—রয়েছে সে পরশ-অতীত, পল্লী ব্যপিয়া দূর-বিস্তৃত।

ক্লান্ত-শ্রান্ত পদে সে বক্রেশ্বর নদীর কিনারে কিনারে হাঁটিতেছে—সামনেই বক্রেশ্বরের শ্মশান দেখা যাইতেছে। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন কেহ কাড়িয়া লইয়াছে—সে আর হাঁটিতে পারিতেছে না। তাই নদীর ধারে তৃণশয্যায় সে আশ্রয় লইয়াছে। মনে হয় তারই পাশে কাদু বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

সুপ্রভাতের পাশে ঘুমায় বিদেহিনী প্রিয়া—পূরণ করিতে তার হিয়া—মরে নাই, মরে নাই, খুঁজলে তারে সুপ্রভাত অন্তরে পায়। মানবী মূর্ত্তি ধরেছে কাদু—তার সর্বাঙ্গে যেন মাখা আছে যাদু—এই পূর্ব-জোছনা রাতে পল্লী তখন নিশীথ বাসরে—

কাদু ডেকে নিল তার তৃণ শয্যা পরে

ঘুমে অচেতন সারাটি বিশ্ব

শুধু জাগে দুটি প্রাণী

শুক্লা পূর্ণিমা রাতি—তৃণশয্যা পরে, মেঘের চালুনী ঢালিছে

চাঁদের ভাতি—

তারারা মেলেছে তাদের পদ্মকলির আঁখি

পল্লী প্রেয়সী জাগায় বাসর—জোছনায় ওড়না ঢাকি—

ফুটেছে গো কমল মন্দার বিলে—রাত আর নাই বাকী।

ঐ শোন ? পাখীর ডাক্—ভোর হয়ে এলো বুঝি।

ধীরে ধীরে সুপ্রভাত অতলতলে তলিয়ে যাচ্ছে—সে যেন কাদুর হাত ধরে আকাশ-পানে কাহাকে খুঁজিতেছে—স্বামীজী—স্বামীজীকে। অদূরে মৃত্যুর ঘোরে সে প্রত্যক্ষ করিতেছে—আজানুলম্বিত পদ্মপলাশ লোচন জ্যোতিময় দেহে স্বামীজী তাহাদের যুগলকে দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

সুপ্রভাত চীৎকার করে—"জল দাও, জল দাও"

কে দেবে জল ?

বিদেহিনী কাদু সুপ্রভাতের শিয়রে অপেক্ষা করিতেছে—কখন তার আত্মাটি দেহ হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

ভোর হইয়া গিয়াছে—বক্রেশ্বর ধাম ক্রমশঃ কার্য্যে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এমন সময় কে একজন ঝাঁপড়তলাবাসী বৈষ্ণবদের আখড়ায় খবর দিতেছে যে সুপ্রভাতের মৃতদেহটি শ্মশানের সন্নিকটে নদীর ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। মৃতদেহের পাশে নামানো আছে একটি ঝোলা—তারমধ্যে রয়েছে একটি কাদু বোষ্টমীর ফটো, তার ব্যবহৃত একতারাটি এবং কাদুর নিত্য-ব্যবহৃত কিছু তৈজস-পত্রাদি।

ওদিকে শ্মশানে বসিয়া কোন এক বৈষ্ণব গান ধরিয়াছে—

শোন হে মাধব !

স্মরি শ্রীমতির মুখ-খানি
বিরহেতে হিয়া ফাটে
বিরহেতে দিন কাটে
অগ্নি জ্বালা বোধ করি প্রাণে
পরাণ কাঁপিছে বিরহের টানে।

দুইদিন পূর্বে আখড়ার লোক জানিতে পারিয়াছে, তাহাদের সবার প্রিয় কাদুর বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হইয়াছে। তাই তাহারা এখানে সুপ্রভাতের মৃতদেহের নিকট ভীড় জমাইয়া কাদুর ব্যবহৃত জিনিষগুলি নাড়া-চাড়া করিতে থাকে। সুপ্রভাতের জন্যও তাদের আক্ষেপের অন্তঃ নাই—কারণ, সেই আপন ভোলা লোকটি কোন অজান্তে কামনা-বাসনার উর্দ্ধে কাদুকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল, সখীভাবে সে ছিলো তার বৈষ্ণবী প্রিয়া।

বক্রেশ্বরে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে, একসাথে দুটি বিষাদ-বার্তা—কাদু বোষ্টমীর মৃত্যু আর তার সাথে প্রিয় সত্যানন্দজীর অন্তর্ধ্যান। কাদু বোষ্টমীর মৃত্যুর কথা তল পড়িয়া গেলেও বেশ কয়েকদিন ধরিয়া স্বামী সত্যানন্দের বিরহে আপামর জন-সাধারণ কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। কাতারে কাতারে লোক সত্যানন্দজীর নদীর কিনারে পরিত্যক্ত গাড়ীটি অবলোকন করিয়া আপশোষ করিতে থাকেন। কবে ফের তিনি এই বক্রেশ্বর ধামে ফিরিবেন—বুকে বাঁধ দিয়া তাঁহারা অপেক্ষা করিবেন সেই দিনের অপেক্ষায়। শেষ দিনে স্বামীজীর শেষ উপদেশটি এখনও সকলে স্মরণ করেন, যেন আকাশে-বাতাসে তাহা ধ্বনিত হইতেছে—

"তস্যাহং ন প্রণশ্যামি—
স-চ-মে-ন প্রণশ্যতি।"

"ভক্তের মন যেমন ঈশ্বরতে সর্বদাই থাকে—ঈশ্বরের দৃষ্টিও সেইরূপ ভক্তের উপরে থাকে।"

ঈশ্বর সর্বভূতে রহিয়াছেন! আকাশের মেঘ অপসারিত হইলে যেরূপ সূর্য্যকে দেখা যায়—সেইরূপ কামনা-বাসনা, মন ও হৃদয়রূপ আকাশ হইতে সরিয়া গেলে জীব আপনার ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারে। আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে না পারিলে মুক্তিলাভ কখনও ঘটে না।

"নাহং ব্রহ্মেতি জানাতি
তস্য মুক্তির নঃ বিদ্যতে।"

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি জীবকে সর্বদাই চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মহামায়ার অনুচর ছাড়া অন্য-কিছু নহে। বোধরূপী সরোবরকে বিষয় পঞ্চ দ্বারা ঐ সরোবরের জল ঘোলা করিয়া রাখিয়াছে—তাহাতে মানুষ বা জীব নিজ ছায়া দেখিতে পায় না। আত্মজ্ঞান যাহাতে না আসে তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পঞ্চভূত জীব শরীরের বিষয় ভোগ করিতে থাকে, আর বোধরূপী আত্মা মহামায়ার ভ্রান্তি জালে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বাস করে যে বিষয় পঞ্চক "আমিই" তাহা ভোগ করিতেছি।

তোমরা ত্যাগ করিতে শেখ—ভোগের মধ্যে ত্যাগ আছে। নিজ নিজ সংসারে লোকদের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি, সমাজের প্রতি যে কর্ত্তব্য পালন করা যায় তাহাই ত্যাগ বলা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়ের কাজ করিবে কর্ত্তব্য কর্ম হিসাবে—কিন্তু তাহার ফলের প্রতি আকৃষ্ট হইও না। ইহাই ছিল তাঁহার সংসারী লোকদের প্রতি শেষ উপদেশ।

✪ হরি ওঁ তৎসৎ ✪